শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও
শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

প্রাপ্তিস্থান
ইষ্টার্ণ-ল-হাউস্
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

ভূমিকা

'মণ্টুর মাষ্টার' ইষ্টার্ণ ল' হাউসের বার-করা আমার প্রথম বই। তার আগে আমার আর কয়েকখানি বই বোধ করি বেরিয়েছিল, 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' ইত্যাদি, ঠিক কখানা, মনে পড়চে না। তাঁদের বার-করা এই আমার তৃতীয় বই, যদিও এর মাঝখানে, আমার আরো খান্‌ত্রিশেক বই বেরিয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেন, মণ্টুর মাষ্টারে, বা, পঞ্চাননের অশ্বমেধে (কিম্বা 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র মধ্যে) আমি যেরকম গল্প লিখেছি সেরকম আর পারিনি। তার পরের আর কোনো বইয়েই পারিনি। খুব আশ্চর্য্য নয়। এককালে আমি খুব ছোট ছেলে ছিলুম, আমার কিশোর পাঠকদের মতনই প্রায়, কিন্তু এখন যতই না কেন চেষ্টা করি না, সে রকমটি আর হতে পারিনে। হবার যে সংকল্প নেই তা নয়, এবং হয়তো কায়কল্পও রয়েছে, কিন্তু যথার্থই তা হওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আমার কেমন একটা সংশয়ও রয়ে গেছে।

আমার লেখার বেলাও ঠিক তাই। আমার পরের পরের লেখাগুলো ঠিক আগের আগের মতো হয় না—কিছুতেই হতে পারে না—নতুন নতুন গল্প নতুন নতুন ধরণে দেখা দেয়। একেবারে আন্‌কোরা হয়ে। তাতে ভালো হয় কি মন্দ হয় তা জানিনে, তবে চিরকালই আমি তাই দেখে আসছি। আমার আগের যা, তা দূরে চলে গেছে এবং যা পরের, তাই আপনার হয়ে এসেছে, এই আমার চিরদিনের অভিজ্ঞতা। এবং আমার বিশ্বাস, ছেলেমেয়েরা, আমার গল্প যারা ভালোবাসে, তারা চিরদিন ধরে' তা আলাদা আলাদা রূপে দেখ্‌বার এবং নতুন নতুন ধরণে পাবার প্রত্যাশাতেই ভালোবাসে। এবং চিরদিন ধরে' তাই ভালো বাস্‌বে, আমি আশা করি।

তবে একথা হয়তো ঠিক, আমার গল্প পড়ে' খুব ছোট যারা, তারা তেমন রস পায় না। যারা একটু বেড়ে উঠেচে, বয়সে এবং বুদ্ধিতে, আমার গল্প নাকি তাদের জন্যেই। এ অভিযোগ মেনে নিতে লজ্জা নেই, কেননা, সবার মতো করে' রচনা করবার ক্ষমতা একমাত্র বিধাতারই রয়েছে। এবং সাহিত্য-সৃজনে যাঁরা বিধাতার সমগোত্র, তাঁরাই কেবল তা পেরে থাকেন। শুধু সকলের মতো করে' নয়, সব দেশের এবং সমস্ত কালের মতো করে' লেখবার তাঁদের দুর্ল্লভ নৈপুণ্য। প্রত্যেক দেশে, প্রতি শতাব্দীতে, সেরকম সৃষ্টিধর দু'একটি মাত্র প্রকাশ পায়। আমাদের দেশেও রয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র।

কিন্তু আমার মুস্কিল এই, বিধাতার সমকক্ষতাও আমার নেই, অথচ, ছোট ছেলেমেয়ের সমসাময়িকতাও আমি হারিয়েছি। মানসিক সমসাময়িকতার কথাই

বল্‌চি খুব ছোটদের মনের মতো করে' লিখ্‌তে হয়তো আমি আর পারিনে। মণ্টুর মাষ্টারের সঙ্গে, মামার জন্মদিন কিম্বা ফুট্‌বলের দৌড়—অথবা, এ-বইয়ের আমার গল্পের কতো তফাৎ! এই ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে, সময়ের এই সেতু পেরিয়ে, কোনো দিন কি আর আগের জগতে আমি ফিরে যেতে পারব? বোধহয় না।

এর হয়তো রহস্যময় একটা হেতুও থাক্‌তে পারে। যাদের জন্যে আমি 'মণ্টুর মাষ্টার' লিখেছিলাম, যারা এককালে খুব ছোট ছিল, তারা এখন বেড়ে উঠেচে; যাদের আমি 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র গল্প শুনিয়েছি, যাদের জন্য একদা 'হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি' বাধিয়েছি,—কী না করেছি তাদের জন্য!—তারা এখন বড় হয়ে আমার কাছে অন্য গল্প শুন্‌তে চায়, তাদের মনের মত গল্পই পেতে চায় তারা। সেই অসংখ্যের একজনকেও আমি চিনিনে জানিনে, কিন্তু যখন আমি লিখতে বসি, তাদের অলক্ষ্য ইঙ্গিত আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের না-পাঠানো পরোয়ানা আমাকে প্রেরণা দিতে থাকে, হয়তো আমার অগোচরেই; এবং সেই কারণেই হয়তো পর পর আমার যতো গল্প, আরো বড়ো আরো বড়ো এবং আরো বড়োদের মতো হতে হতে চলেছে, কোথায় চলেছে, কে জানে! সেকালের সেই অচেনা ছেলেমেয়ের দল, অদৃশ্য আকর্ষণে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, এবং আমিও তাদের গল্প যোগাতে যোগাতে, নিত্য নতুন হাসির যোগান্ দিতে দিতে, তাদের যোগ্য হতে হতে চলেছি!

অথচ এ-যুগেও নতুন ছেলেমেয়েরা এসেছে, স্বর্গভ্রষ্ট শিশুর দল, তাদের জন্যে লেখক কই? তারাও গল্প শুন্‌তে চায়, তাদের জন্যেও চাই হাসির যোগান্! অনিত্যকালের শিশুর কণ্ঠেও নিত্যকালের দাবী—কে আমাদের আনন্দ দেবে? আমি যদি সে দাবী না রাখ্‌তে পারি, সে-চাহিদা মেটাতে, নতুন লেখক আস্‌বেন। খুব ছোটদের কচি কচি মুখে হাসি ফোটাবার তাগিদেই তাঁরা আস্‌বেন—এবং সে বড় কম প্রয়োজন নয়। অফুরন্ত পৃথিবী আর অনন্তকাল জুড়ে বিধাতা তার আয়োজন করে' রেখেচেন।

এবং বলা যেতে পারে, শিশুসাহিত্যে সেই লেখক এসেচেন। গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসুকে আমি সেই লেখক মনে করি। খুব ছোটদের মতো করে' খুব চমৎকার গল্প লেখবার তাঁর অসামান্য ক্ষমতা, তাদের হাসির খোরাক্ যোগাতেও তিনি অনন্যসাধারণ। তার ওপরে, গৌরাঙ্গের গল্প হচ্ছে সেই জাতের, যা ছোটদের জন্য মুখ্যত হলেও, ছোটরা পড়ে' মজা পেলেও, বড়োরা উপভোগ করতে বাধা নেই. বয়স্কদের পাতেও অসঙ্কোচে দেয়া চলে। এই ঈষ্টার্ণ ল'

হাউস থেকেই, সগুপ্রকাশিত, তাঁর 'সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি'র যে-কোনো গল্প যে-কেউ পড়বেন তিনিই এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। এবং এই বইয়ের সুযোগে, আমি আরেকটি ছোটদের লেখককে সাহিত্য-জগতে পরিচিত করার আনন্দ লাভ করছি। শ্রীমান্ ধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারীকে।

গৌরাঙ্গপ্রসাদের গল্পের ভেতরে—তাঁর প্লটের নূতনত্বে, প্রকাশ-ভঙ্গীর নিজস্বতায়, হাস্যরস-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে, এমনকি তাঁর কথার কারুকার্য্য, ভাষার কারিকুরি আর সংলাপ-রচনার দক্ষতার মধ্যেও, স্বতন্ত্র এবং মৌলিক, এমনকিছু একটা আছে যা কেবল প্রথম শ্রেণীর নয়, একেবারে নতুন ধাঁচের—সত্যিই যা পাঠককে চমৎকৃত না করে' পারে না।

এই লেখকটির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপেই মুখে মুখে গল্প বানানোর এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম—যাঁরাই তাঁর সম্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তা টের পেয়েছেন—যে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। গৌরাঙ্গর বহু মৌখিক গল্পকে ভিত্তি করে', বহুল করে', বহুৎ মারপ্যাঁচে আরো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার একাধিক গল্প লিখিত,—এই বইয়েই 'বাজার করা সোজা নয়' গল্পটির প্লট্ গৌরাঙ্গের দেয়া—এর থেকেও, এই লেখকের গল্পের ধারণা, এবং প্লটের বাঁধুনি, কিরূপ আশ্চর্য্য ধরণের, তার-কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

ওর বিস্তর গল্প বাজেয়াপ্ত করবার পর, সাদা কাগজে সুবিস্তৃত করবার পরে, অবশেষে, না বলে' আমি আর পারিনি, তোমার গল্প তুমিই লেখনা কেন হে? লিখলেই পারো। মুখের বানানোকে কলমের মুখে আনানো এমন কি শক্ত? খাতার বুকেও সাজাতে পারবে, দ্যাখোনা চেষ্টা করে'—হয়তো ভয়ানক খুব সাজা হবে না! এবং তার ফলে, শিশু-সাহিত্যের আসরে, যে শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, তাকে টেনে নিয়ে আসার কিছুটা আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই আমার।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বাঙ্গালীর জগতে নতুন ধরণের হাসির গল্প এনেছেন। সত্যিকারের হাসির গল্প কেউ লিখ্‌তে পারলে সত্যিই এমন আনন্দ হয়! বাঙ্গালীর জীবনে চারিদিকেই এত দুঃখ, চারধার থেকেই এত চাপা—তার গুমোটের মধ্যে আলো আর অবকাশ এত কম, যে যদি কেউ তাঁর লোকোত্তর প্রতিভায় তাদের প্রতিদিনের পরিবেশের মধ্যে এই দুর্ল্লভ রসের পরিবেশন দিয়ে, কোনো ফাঁকে এতটুকু উল্লাসও নিয়ে আসেন, অন্ততঃ তাদের কৈশোর-কালটাও হাস্য-মুখর করে' রাখতে পারেন, তাঁর প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের সমুচ্ছ্বসিত অভিনন্দন না জানিয়ে আমি পারিনে।

এই বইয়ের যতো গল্প আর ছবি

শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী লিখিত—

এই বইয়ের যতো গল্প আর ছবি

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত—

এই বইয়ের 'বাজার করা সোজা নয়' গল্পটি; গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর দেয়া একটি প্লটের ওপর ভিত্তি করে' লেখা

রাণু এবং অণিমেশ,

সুনীলকুমার আর সলিলকুমারকে

আমাদের রামহরিবাবু অনেক দিন ধরেই কঠিন রোগে ভুগছেন। এই রোগে ভোগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ রামহরিবাবু যে রকম কঞ্জুস্, তাতে বোঝা শক্ত ছিল না যে অসুখ-বিসুখ একটা কিছু তাঁর হবেই। হবেই নির্ঘাৎ। হলেই হোলো একদিন! এবং হলে' সে অসুখকে আর সহজে ছাড়ানো যাবে না।

আমি নিজেই একদিন সেধে গিয়ে তাঁকে বল্লাম, "দেখুন, রামহরি বাবু! শরীরের একটু যত্ন নিন্! কোথাও চেঞ্জে টেঞ্জে চলে যান্ বরং?"

শোনা-মাত্রই রামহরিবাবু খাপ্পা হয়ে উঠলেন, বল্লেন, "চেঞ্জে? চেঞ্জে কেন? চেঞ্জে তো কেবল গাধারাই যায়! যাদের অঢেল্ টাকা আর টাকা যাদের কাম্ড়াচ্ছে তারাই যায় চেঞ্জে—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম, "কেন, আপনার টাকাটাই বা এমন কম কি মশাই? আপনিও তো একজন বড়লোক বিশেষ। আর তাছাড়া, শরীরের জন্যেই তো খরচ করা, বাজে খরচ তো নয়!"

"খুব টাকাটা দেখেছেন আমার! আমার টাকা আছে আমার আছে, আপনার তাতে কি? আর আমার এমন কী অসুখ হয়েছে যে খামখা আমি চেঞ্জে যাবো? আমাকে কি একটা গাধা পেয়েছেন নাকি? তারচেয়ে আপনি ওই গাধাটাকেই চেঞ্জে যেতে বলুন—"

এই বলে' রামহরিবাবু বিচরণশীল পাড়ার একটা গর্দ্দভের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এবং বল্লেন, "ওরও ব্যায়রাম কম নয় মশাই, আমারও যা অসুখ ওরও তাই। দেখুন্ দিখি চেষ্টা চরিত্র করে', বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে চেঞ্জে পাঠাতে পারেন কি না!"

আমি বল্লুম, "চেঞ্জে না যাবেন না যান্, আপনার ভালোর জন্যেই আমার বলা মশাই! আপনি কী ছিলেন আর কী হয়ে গেছেন, নিজেই কি বুঝ্তে পারছেন না? ছিলেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর এখন হয়ে গেছেন একেবারে কড়ে আঙুলটি! এরকম হওয়াটা কি ভালো হয়েছে আপনার? চেঞ্জে না যান্, নাই যাবেন, ভালো খাবার দাবার খেলেও তো হয়! দু'চার টাকা তো খরচ কর্তে পারেন! তাই করুন না কেন?"

তার উত্তরে তিনি রেগে বেগুণ হয়ে বল্লেন, "কেন? আমি কি খেতে জানিনে? ভালো খাবার কি আমি খাইনে কখনো? এই তো দুমাস আগে একছটাক্ ঘি খেয়েছি—খাঁটি গাওয়া ঘি পুরো এক ছটাক্! আর এই রবিবার আধখানা আপেল্—প্রায় গোটাটাই গিলেছি বল্তে গেলে। এগুলো কি খারাপ খাবার? এগুলো কি উত্তম নয়?"

আমাকে তাড়াতাড়ি সট্কে পড়্তে হোলো। উত্তমের পরেও, আরো নানাবিধ খাদ্য রয়েছে, উত্তম-মধ্যম-জাতীয়, কি জানি, যদি তারই

ছ'একটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। বলা তো যায় না। রামহরিবাবু যেরূপ খাদ্যবিলাসী এবং যে রকম চটেছেন, তাতে উত্তম থেকে উত্তম-মধ্যমে নাম্‌তে তাঁর কতক্ষণ ?

"ছিলেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, আর হয়ে গেছেন এখন কড়ে আঙ্গুলটি !—"

কিন্তু আমার কথা হয় তো একেবারে বিফল হয় নি। আমার উপদেশেই কি না, যদিও সঠিক করে' বলা যায় না ; তবু, এই সেদিন রামহরি বাবু একজন ডাক্তারের কাছে বিনা ভিজিটে, (ডাক্তারটি

তাঁর নিজেরই আত্মীয়) নিজের অসুখ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু অনেক পরীক্ষা করে' অনেকক্ষণ দেখে শুনে বল্লেন, "কয়েক মাসের জন্যে চেঞ্জে চলে যান্ না কোথাও ?"

রামহরিবাবু একটু ইতস্ততঃ করে' জবাব দিলেন, "দেখুন্, চেঞ্জে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না, কারণ তাতে অনেক টাকা খরচ। একলা তো আমি যেতে পার্‌ব না, গিন্নিও সঙ্গে যেতে চাইবে, আর, ছেলেরাও ছাড়বে না। আমার পক্ষে হাওয়া খেতে বেরুনো অসাধ্য, তবে, হাওয়া ছাড়া, অন্যান্য খাদ্যের অদলবদল করে' যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি করা কিছু সম্ভব হয় তাই বরং বলুন্ আমাকে।"

ডাক্তার বল্লেন, "বেশ, সে-রকমও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। সেটা হচ্ছে ভাইটামিন্ খাওয়া। তাই করে' দেখুন্ তাহলে দিনকতক।"

রামহরিবাবু এবার আর বিশেষ আপত্তি করলেন না। কারণ এ কাজটি আগের চেয়ে ঢের সোজা।

তার পর থেকে আরম্ভ হোলো রামহরিবাবুর ভাইটামিন্-পর্ব্ব। শশা থেকেই সুরু করলেন একেবারে। ফির্‌তি পথে, রাস্তায়, এক শশাওয়ালাকে দেখ্‌তে পেয়েই তিনি শশব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। তার কাছ থেকে এক পয়সা দামের একটা শশা কিনে ফেল্‌লেন তক্ষুনি—তেমন খুব দরদস্তুর না করেই। তারপর বাড়ী ফিরে, ছেলেমেয়েদের অগোচরে, তার অর্দ্ধেকটা ওবেলার জন্যে রেখে, বাকী আধখানা মুখে পুর্‌তে যাচ্ছেন, এমন সময় কোত্থেকে পুত্রকন্যাদের আবির্ভাব হোলো। রামহরিবাবু তাড়াতাড়ি শশাটা মুখের মধ্যে পু'রে দিলেন, পাছে ওরা

সবাই মিলে ভাগ বসিয়ে রামহরিবাবুর ভাইটামিন কমিয়ে ছায়। কিন্তু লোভী ছেলেমেয়েরা, বারার মুখের দিকে না তাকিয়ে, মুখের বাইরের, বাকী আধখানার দিকে হাত বাড়াল।

রামহরিবাবু শশাটিকে মুখস্থ করে' প্রায় কাম্‌ড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কাম্‌ড়ানো আর হোলোনা, দাঁত বসাবার আগেই বার করে' এনে সেই শশাটিকে সবার মধ্যে সমভাবে বিভাগ করে' দিয়ে যৎসামান্য একটু ভগ্নাংশ তিনি আত্মসাৎ করতে পারলেন।

তারপরদিন রাস্তায় যেতে যেতে রামহরিবাবু একটা কালো জাম কুড়িয়ে পেলেন। বেশ বড়ো সড়ো, নাত্নুস্‌নুত্নুস্‌, এক কালো জাম। সবার চোখের আড়ালে, লুকিয়ে সেটিকে তিনি পকেটফাই করলেন। মোটা-সোটা সেই গোটা জাম্‌টাই। তারপর বাড়ী এনে, একা সমস্তটা খেতে তাঁর সাহস হোলো না, কেননা দেখা গেছে, কিছু একটা মুখে পুরে দেবার পরেই ছেলেমেয়েরা কোত্থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। সেই কারণে, আগে থাক্‌তেই, সবাইকে ডাকিয়ে এনে, জমা করে' ব্লেড দিয়ে কুচি কুচি করে' কেটে কেটে সেই জাম ছেলেমেয়েদের ভেতর সমান ভাগে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা করে দিলেন। এবং নিজে, ভাইটামিন-পরিপূর্ণ বীচিটি খেলেন কেবল।

এইভাবে ভাইটামিন খাবার তাগিদে, রামহরিবাবু, ভাতের ফ্যান্‌, আটার ভুসি, আলুর খোসা, কুম্‌ড়োর খোলা, কপির ডাঁটা,—এক কথায় গাছের পাতা, মাছের আঁস, আর ঝাঁটার কাঠি এই তিন বস্তু বাদ দিয়ে, খাদ্যাখাদ্য আর যা কিছু ছিল, সবই রীতিমত সেবন করতে লেগে গেলেন। এবং অনেকটা নিরুপদ্রবেই, বল্‌তে গেলে, কেননা,

অনেক অনুরোধ-উপরোধেও এ-জাতীয় সব ভাইটামিনে ছেলেমেয়েদের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। রুচি তো নয়ই!

একদিন রামহরিবাবু বাজার থেকে ঘেয়ো-একটা বেগুণ কুড়িয়ে পেয়ে,—কি বরাত! বেমক্কা এক বেওয়ারিশ বেগুণ, অযাচিতই পেয়ে গেলেন!—তাই বাড়ী এনে পুড়িয়ে খাবার মৎলবে পুরনো খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে সেই উদ্যোগে রয়েছেন, এমন সময়ে মিসেস রামহরি এসে মিষ্টার রামহরির কীর্ত্তি দেখে হি হি করে' হেসে উঠলেন, বিদ্রুপ করে' বল্লেন, "বলি, দিন দিন কি তোমার মাথা আরো খারাপ হচ্ছে না কি? এইটুকু আগুনে তোমার ঐ বেগুন পুড়বে?"

রামহরিবাবু মুরুব্বি চালে একটুখানি হাসলেন, "বেগুনের কথা বল্‌ছ গিন্নী? বেশী পোড়ালে যে ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায় তা জান না বুঝি? এবার থেকে জেনে রাখো।"

ভাইটামিনের বিষয়ে রামহরিবাবুর উৎসাহ ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। ধাপে ধাপে বেড়েই চল্‌ল ক্রমাগত! শাক্‌-সবজী ছেড়ে, ফলমূলের দিকে তিনি এগিয়ে পড়লেন অবশেষে!

একদিন রাত্রি বেলা কমলানেবু কেনবার জন্যে তিনি বাইরে বেরিয়েছেন,—একটু সেজেগুজেই বেরিয়েছেন, বল্‌তে কি! দিনের বেলা, খালি গায়ে খালি পায়েই বাজারে যান্‌ বটে, কিন্তু রাত্রে একটু বেশভূষা—সামান্য একটু বিলাসিতা—না করলে কি ভালো দেখায়? তাঁর গায়ে, গিন্নীর বাতিল্‌ করা—ফেলে-দেওয়া এক ব্লাউজ (যেটা তিনি ফতুয়ার মতো ব্যবহার করেন) এবং পায়ে বহু পুরনো কেট্‌স।

নামেই কেটস্, কেন না তালিতে তালিতে, তার সমস্তটাই প্রায় চাম্ড়ায় ভর্ত্তি, খালি কোথাও নেই। যাই হোক্, সেই জুতো পায় এবং ফতুয়া গায়ে, রামহরিবাবু বাইরে বেরিয়েই, কাছের গলির মোড়েই এক

কমলালেবুওলাকে পেলেন। বেচারা ভালো লেবুগুলো বড় রাস্তায় বেচে, পচা লেবুগুলো ওংরাবার জন্যে, অন্ধকার ঘুপ্চির মধ্যেটায় এসে বসেছিল! রামহরিবাবু, তারই ভেতর থেকে অনেক বাছাবাছি করে' ছুটো

পছন্দ করে’ দর-কষাকষি কর্‌তে যাবেন, এমন সময়ে পাড়ার ধোপাদের গাধাটা, যাকে একদা চেঞ্জে পাঠাতে চেয়েছিলেন রামহরিবাবু, ছেলেদের তাড়া খেয়ে,—পাড়ার গাধারা প্রায়ই জনপ্রিয় হয়,—ছুটে এসে, আত্মীয় কি হিতাকাঙ্ক্ষী কী ভেবে বলা যায় না, রামহরিবাবুর ঘাড়ে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল।

গাধার ধাক্কায় রামহরিবাবু কাৎ হয়ে গেলেন, কিন্তু কতক্ষণ আর? তক্ষুনি উঠে পড়ে, রেগে মেগে, তিনি গাধাটাকেই কাৎ করে’ ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে, গাধার সঙ্গে তাঁর দস্তুর মতো বাহুযুদ্ধই বেধে গেল! সেই ঘোরতর সংঘর্ষে কখনো গাধা উপরে, তিনি নীচে, কখনো বা তিনি নীচে আর সেই গাধাটাই উপরে;—এই ভাবে, (শিবরাম-বাবুর ‘ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি’ করবার মতো) গাধার সঙ্গে গাদাগাদি করে’, অল্প ক্ষণেই রামহরিবাবু বেজায় কাবু হয়ে পড়্‌লেন।

এবং, গাধাটাও তাঁকে পরাজিত করে’, জয়ধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে আরো বেশী অন্ধকারের মধ্যে সরে’ পড়ল।

এই দুর্ঘটনার ফলে রামহরিবাবুর বেশ একটু ক্ষতি হোলো। তাঁর অমন সাধের ব্লাউজ্‌-মার্কা ফতুয়াটা ছিঁড়ে গেল। জুতোটার এক পাটি গাধাটা মুখে করে’ নিয়ে গেছে। যুদ্ধের জয়পতাকা হিসাবেই বোধ হয়। কাজেই রামহরিবাবুর দুঃখের অন্ত রইল না! গিন্নী বোধ হয় তাঁর উপর দয়া করে’ আর একটা ফতুয়াও দেবেন না! আর জুতো? জুতো যদি একান্তই আর-একটা ঐ রকমের নাই মেলে, কুড়িয়ে বাড়িয়েও না পাওয়া যায়, তবে পেঁচোর (রামহরিবাবুর বড় ছেলের)

জল-চর পুরনো রবারের জুতোটা কেটে নিয়ে যুতমতো বানিয়ে, চটির ন্যায় ব্যবহার করা যাবে। তবে ছেলেটা দিলে হয়! যা ছেলে!

রামহরিবাবুর দৃশ্য দেখে গিন্নী ককিয়ে উঠলেন, "তোমার এ-দশা কে করলে গা? য়্যাঁ?"

"আর বোলো না গিন্নী!—" বলতে গিয়ে রামহরিবাবুর দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে গেল,—"একটা গাধা! কে জানে যে সেই গাধাটারও

"সেই গাধাটারও যে আমারই মতো ব্যায়রাম তা কে জান্‌ত!"

আমারই মতো ব্যায়রাম,—একই ব্যায়রাম আমাদের তা কে জান্‌ত! আমি একটা গলির মোড়ে বসে', কমলানেবু কিন্‌ছি, তারো যে সেই সময়েই ভাইটামিনের দরকার পড়েছে তা কি করে' বুঝ্‌ব? বেশ

এক চোট্ মারামারি হয়ে গেল আমাদের! না বলে' কয়ে' আমার পিঠের উপর উঠে পড়েছিল হতভাগা! নাঃ, এমন করে', গাধাতেও যদি পিছনে লাগে, ভাইটামিনের জন্যে রেষারেষি লাগায়, ছুট্ পাট্ লাগিয়ে দ্যায়, তাহলে আর কাঁহাতক্ পারা যাবে? মানুষে কখনো গাধার সঙ্গে পারে? পেরে ওঠে কখনো? আর ওদেরই বা দোষ দেব কি? ওদের তো আর পয়সা নেই যে চেঞ্জে যাবে? বল্লেই ওরা চেঞ্জে যেতে পারে না, তাই যা পায় বিনে পয়সায়, মেরে ধরে' কেড়ে কুড়ে খেয়ে ন্যায়,—কি করবে বলো? গাধারা তো টাকা খরচ করতে পারে না। অতএব, চলো আমরা চেঞ্জেই যাই? কি বলো গিন্নী?"
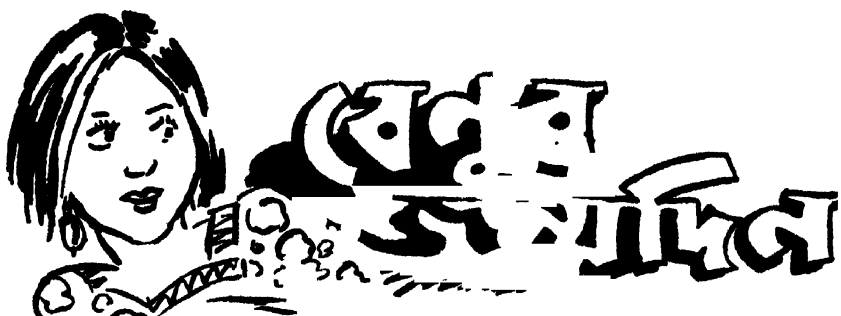
বিতিকিচ্ছিরি এক বাজ্‌খাঁই—উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদের সঙ্গে বেড়ালের আর্ত্তনাদ মেশালে যা হয়—শার্সীর ফাঁক্ দিয়ে ভেসে এল।

শার্সীর ফাঁক্? হ্যাঁ! কী বদ্‌খেয়ালে মনে নেই, শ্রীমতী বেণুর বিগত জন্মদিনে, একটা গুল্‌তি ওকে উপহার দিয়েছিলাম। সেদিনই আমার পড়ার ঘরের শার্সীতে এই ফাঁক্‌টার উদ্ভব হয়েছে। তারপর থেকেই, পথ-চল্‌তি যা-কিছু আওয়াজ—কী মোটরের, কী ভিখিরির, আর কী ফেরিওলার—সবই ঐ অনর্গলতার ভেতর দিয়ে অবলীলা-ক্রমে ভেসে আসে!

বেণু? বেণু আমাদের প্রতিবেশী জোয়ারদার মহাশয়ের দুহিতা, এবং পাড়ার আমরা সবাই হচ্ছি ওর দুহিত। এক ফোঁটা একটু মেয়ে, কিন্তু এই বয়সেই দোহনের এত কৌশল ওর জানা যে কী বল্‌ব!

শার্সীর ফাঁকির মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে তাকাই। সঙ্গে সঙ্গেই জানালা—বা জানালার ধ্বংসাবশেষ, যাই বলো—উন্মুক্ত করে' ফেল্‌লুম

হয়। উক্ত গুল্‌তি হস্তে, শ্রীমতী বেণুই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। তিনিই তারস্বর ছেড়েচেন—

"কাকাবাবু—কাকাবাবু। আমি তোমাকে ডাক্‌চি—"

বেচারা পড়্‌শীরা—আমরা সবাই ওর বেসরকারী কাকা। বিনা বেতনে, এমন কি অনিচ্ছাসত্ত্বেই, ওর পিতৃব্যপদে অভিষিক্ত!

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি নীচে নেমে পড়ি।

একে অভ্রভেদী বেণু, তার ওপরে ওর হাতে স্বয়ং গুল্‌তি—ওর ভেদাভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হতে কতক্ষণ? আমার নিজের মধ্যেই ছ্যাঁদা হয়ে যেতে পারে।

এক ছুটে বেণুর পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

"তোমাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে এলুম," বেণু বলে: "আমার বার্থ-ডে পার্টিতে এসো। শুক্কুরবার দিন। তোমাকে আস্‌তেই হবে, তুমিই আমার সব চেয়ে ভালো কাকাবাবু কি না! এসো কিন্তু?"

আমি ইতস্ততঃ করি: "শুক্কুরবার? কিন্তু—সেদিন? সে দিন যে আমার—! সেদিন কিন্তু—" কিন্তু-কিন্তু করতে থাকি।

"একেবারে বড় বড় লোকের পার্টি—তোমার কোনো ভয় নেই কাকাবাবু!" বেণু আমাকে উৎসাহ ছ্যায়: "ছোট্ট ছেলেপিলেরা একদম্ বাদ্—কেউ নেই! কাউকে তাদের ডাক্‌ছিই নে—ভারী গোলমেলে তারা। বড্‌ড চ্যাঁচায়।"

য়্যাঁ? বেণুর হলো কী? আমি বেণুর দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাই। আমার ধারণা ছিল, কেবলমাত্র গলার জোরেই ও টিকে রয়েছে; এবং আমরা সবাই কাণের দুর্ব্বলতার জন্যই শুধু কাহিল হচ্ছি।

"এবার আমি ঠাণ্ডা আর লক্ষ্মী মেয়ে হবো।" কোমলকণ্ঠে বেণু বলেঃ "আর চ্যাঁচাব না। গোলমাল করা ভালো নয়। তা হলে তুমি আস্‌ছ তো কাকাবাবু? অবিনাশ-কাকাও আস্‌বেন—সুষমা-কাকীও—বুঝ্‌লে।"

"মুখুজ্যে!" চোখ-হাত কপালে তুলে অবিনাশ বলে।

এটা সুসংবাদ বটে। অবিনাশ-পরিবারের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতাই রয়েছে। সুতরাং নিশ্চয়ই যে যাবো, বেণুকে নিঃসংশয়ে জানিয়ে দিতে কোনো বাধা হয় না।

সন্ধ্যেবেলায় অবিনাশের সঙ্গে দেখা হলে কথায় কথায় বেণুর জন্মতিথির কথাটা উঠ্‌ল।

“ও, হ্যাঁ—” বল্‌লে অবিনাশ: “ভারী চমৎকার মেয়ে বেণু। আমরা না গেলে ও খুব দুঃখিত হবে, দুঃখিত করতে ওকে চাইনে, কিন্তু উপায় নেই—” দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর সমাধা হয়: “যাওয়া হয়ে উঠ্‌বে না আমাদের।”

“কেন বল তো?” আমি একটু বিস্ময়ান্বিতই। “ও তো বলেছে ও চ্যাঁচাবে না। নতুন জন্মদিনের আশঙ্কায় ওই রকম কি একটা সঙ্কল্পও নাকি ও করে' বসেছে?”

“না, সেজন্যে, না—” ভালো করে' আশেপাশে তাকিয়ে নিয়ে গলাটা পর্দ্দা দু'য়েক নামিয়ে আনে অবিনাশ।

“মুখুজ্যে!” ফিস্‌ফিস্ করে' বলে ও। চোখ এবং হাত কপালে তুলে বলে।

আমি ঠিক প্রণিধান করতে পারি না।

“একটু আগেই জেনেছি।” অবিনাশ জানায়: “মুখুজ্যেদেরও বেণু নেমন্তন্ন করেছে। আর মুখুজ্যেরা যেখানে যাচ্ছে—”

সে-জায়গা কেন যে ওর গন্তব্যের অন্তর্গত নয়, অষ্টাদশপর্ব্বে সুবিস্তৃত, বিরাট এক সামাজিক দুর্ঘটনার বিবৃতি দ্বারা আমার কাছে বিশদ করতে আরম্ভ করে।

বাড়ী ফিরে বীণাকে সব বলি।

“সুষমারা যাচ্ছে না?” বীণা বলে: “না যাক্, আমাদের কিছু যায় আসে না? আমরাও যাচ্ছি নে, দাদা।”

"কেন ? আমাদের আবার কী হোলো ?" আমি বেশ অবাক্ হই।

"প্রতিমা ?" বীণা মুখচোখ ব্যাঁকায় : "প্রতিমারাও যাচ্ছে যে ! বেণু নিজেই আমায় বলেছে।"

আমার দম আট্‌কে আসে। আমিও মাথা নাড়ি। বাস্তবিক্, প্রতিমারা যে-পার্টিতে যাচ্ছে সেখানে পা বাড়ানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব ! প্রতিমার জন্যে ততটা নয়, যতটা বল্‌তে গেলে, ওর— কি বল্‌ব ? প্রতি-বাবার জন্যেই বিশেষ করে' আরো। ওর বরকে দেখ্‌লে এমন এক বর্ব্বরতা আমার মধ্যে চেগে ওঠে যে ইচ্ছে করে এক চড়ে ওটাকে সোজা করে' আনি।

সত্যি বল্‌তে কি, বিনি এবং আমি, বেশ একটু উদার-প্রকৃতিই, কিন্তু তা হলেও—তবু—তথাপিও—প্রতিমা আর তার বরকে মুখোমুখি বরদাস্ত করা আমাদের সহনশীলতার প্রতি, বেশ একটু, বেশী একটু অত্যাচারই যেন।

পরদিন্ সকালে বেণুর সঙ্গে ভেট্ হতেই, দুঃসংবাদটা আমি আস্তে আস্তে ব্যক্ত করি। বেচারীর বড়ো বড়ো কালো চোখ জলে ভরো ভরো হয়ে ওঠে।

"আমি এত দুঃখিত যে—" স্খলিতকণ্ঠে আমি বলি : "তোমার পার্টিতে যেতে না পারায় এত আমার মন খারাপ কি বল্‌ব ?—"ভগ্ন স্বরে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি : "যাক্, তুমি কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মী মেয়েটি ! যেমন আমরা যাচ্ছি নে, তেম্‌নি তার বদলে, তোমাকে ডবল করে' জন্মদিনের উপহার পাঠাবো ! সেটা কেমন ?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই, বেণুর মুখ থেকে মেঘ্‌লা আমেজ কেটে যায়—জল-জলে চোখ আবার জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তেই একখানা হাসিখুসির মলাট একেবারে!

ওর পিতৃব্য-প্রীতির অসারতা দেখে প্রাণে ব্যথা পাই!

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা, পোষ্টাপিসে যাবার পথে, মুখুজ্যের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ!

"এই যে, চক্রবর্ত্তী! এক পাড়ায় থাকি, অথচ পাত্তাই পাওয়া যায় না! থাকো কোথায়? বেণুর পার্টিতে অবিশ্যি দেখা হোতো তোমার সঙ্গে—বিনিও আস্‌ত নিশ্চয়? অনেকদিন ওকে দেখিনি, কিন্তু ভাই—" মুখুজ্যে ধীরে ধীরে বিস্তারিত হয়ঃ "কিন্তু বেণুর পার্টিতে আমাদের যাওয়া হোতো না!" খুব খারাপ, বলাই বাহুল্য। আমিই হচ্ছি বেণুর সব চেয়ে ভালো কাকা, বেণু নিজ-মুখেই আমাকে বলে গেছে, অথচ আমার যাবার উপায় নেই—" মুখুজ্যে ক্রমশঃ বিদীর্ণ হতে থাকেঃ "কি করে' যাবো। ওই অবিনাশ-হতভাগাটা—! সেও যাচ্ছে না কি! সপরিবারেই যাচ্ছে। দু'চোখে ওদের আমি দেখ্‌তে পারি নে। সত্যি!"

"এক চোখে দেখ্‌লেও তো পারো?—" মুখুজ্যের কথার ওপর আমি কথা বলিঃ "—টেনে-টুনে কোনো রকমে দেখা যায় নাকি?"

"যাক্, কী আর কর্‌ব!—" মুখুজ্যে বলেঃ "বেণু যাতে মন খারাপ না করে সেই জন্যে বাড়্‌তি উপহার দিতে হবে আমাদের। গেলাম না, তার ক্ষতিপূরণ! কী করব, বলো? তা ছাড়া, শুন্‌লাম্—শুন্‌লাম ঘোষালরাও নাকি যাচ্ছে না—"

"কেন, পায়ে হঠাৎ বাত ধর্‌ল নাকি ?" আমি অনুসন্ধিৎসু হই।

"উঁহু, তা নয়। পাছে তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয় সেই ভয়েই—" মুখুজ্যে ঘোষণা করে।

আমি দাঁড়িয়ে ভাবি। আমার কেমন খট্‌কা লাগে। সমস্তটাই আমার কেমন-কেমন ঠেকে যেন! দূরে, চায়ের দোকানে, জোয়ারদার মশাই প্রবেশ কর্‌ছেন, আমার চোখে পড়ে। আমি মুখুজ্যেকে ইসারা করি।

পরের মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁর টেবিলে গিয়ে বসি; চায়ের হুকুম্ দেয়া হয়; কথায়-কথায় কথা ওঠে:

"তা হলে বেণুর জন্মদিনে এবার একটা জম্‌কালো পার্টি দিচ্ছেন বুঝি?" আমিই উল্লেখ করি।

"পার্টি ?—" জোয়ারদার মশাই চায়ের শেষ চুমুকটি উদরে প্রেরণ করে' আকাশে ভুরু তোলেন: "না তো! পার্টি কিসের? অতো টাকা পাব কোথায়? সেদিন বেণুর মাকে এই সোনা-মাগ্যির বাজারে নতুন ডিজাইনের নেক্‌লেস গড়িয়ে দিতেই ফতুর্ হয়ে গেছি ভায়া! কুকুরের বগ্‌লস্‌টা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়েছে। আবার পার্টি!—"

"এই সব আজ্‌গুবি খবর রটে যে কি করে'—"এই বলে' ক্ষিপ্রপদে, বিক্ষিপ্তমনে জোয়ারদার মশাই তৎক্ষণাৎ দোকান পরিত্যাগ করেন। আক্রমণশীল উদরনীতিক লোকদের ভয়াবহ পাল্লা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চান্ বোধ হয়।

"—কে যে এ সব রটায়! কারা রটায় এই সব! ছি ছি!—",

বল্‌তে বল্‌তে, নিজের জোয়ারের তোড়ে নিজেই তিনি ভেসে চলে' যান।

এবং তাঁর অন্তর্দ্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, অবিনাশ আর ঘোষাল এসে হাজির হয়।

অবিনাশ, শ্রীমান্ মুখুজ্যের দর্শন-মাত্রই বদন বিকৃত করে; আর আমি, ঘোষালের দিকে বিরক্তি-কুটিল ভ্রূকুটি-প্রয়োগ করি। যেমন সচরাচর করে' থাকি ওকে দেখ্‌লেই। যথার্থই ওই বর্ব্বরটাকে প্রতিমার বর বলে' ভাব্‌তেই আমি পারি নে।

বর্ব্বরটাও ভ্রূভঙ্গী করে—আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে ওর কার্পণ্য নেই এবং মুখুজ্যেও অবিনাশকে কিছু কসুর করে না।

কথা না বলেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলি না।

কিন্তু যাই বলো, ছোট্ট একটুখানি জায়গার মধ্যে কতক্ষণ আর ওই করে' পেরে ওঠা যায়? মুখ-চোখ-ভুরু ব্যথা করা কেবল! আর সত্যি বল্‌তে, চায়ের আড্ডা জায়গাটাই খারাপ। সেখানে পাশাপাশি বসে' বেশিক্ষণ রাগ-দ্বেষ পোষণ করাই শক্ত। জোরালো হতে না হতেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়ে—খুব সুকঠিন হৃদয়ও, চায়ের পাকচক্রে, বিগলিত হয়ে আসে—তারপর, বিগলিত অবস্থায়, আপনা থেকেই জমে গিয়ে গদ্‌গদ্ হয়ে উঠ্‌তে কতক্ষণ?

আমাদের মধ্যেও ভাব জমে উঠ্‌তে দেরি হয় না।

"বেশ এখন বোঝা যাচ্ছে," মুখুজ্যে বলে; "যাদের ভেতরে বেজায় আড়াআড়ি বেণু ইচ্ছে করে' বেছে বেছে তাদেরই কেবল নেমতন্ন করেছে। ভালোই জানে যে কেউ তারা আস্‌বে না শেষটায়। পার্টি-টাটি

সব ভূয়ো, কিচ্ছু নেই, শুধু বেশী বেশী উপহার আদায়ের ফন্দি। উঃ, মেয়েটা কী পলিটিশিয়ান্, বাপ্‌স্!"

"মেয়ে-চাণক্য একখানা।" আমি বলে' ফেলি। "বড়ো হলে ও সরোজিনী নাইডু হবে।"

"আশ্চর্য্য, এইটুকু একটা মেয়ের মধ্যে এতখানি ব্যবসা-বুদ্ধি! ভাব্‌তে মনে ভারি আঘাত লাগে। অবশ্যি উপহার আমরা দেব, দেবই, কিন্তু এমন কিছু দিতে হবে যাতে ওর আত্মার উন্নতি হয়। তা' ওর পছন্দ হোক্ চাই নাই হোক্।" ঘোষাল বলে।

কালই বেস্পতিবার—অতএব, আর কালবিলম্ব না করে' এক জোট্ হয়ে আমরা বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়ি। আত্মার উন্নতি এবং সুকুমারমতি বালিকার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, দূরদৃষ্টি-সহকারে উপহার-দ্রব্য সব কেনা হয়। মুখুজ্যে কেনেন একটা বুননের বাক্স আর একখানা হিতোপদেশ; ঘোষাল একজোড়া চীনে মাটির পুতুল আর একটা গোলোকধাম; অবিনাশ একটা বইয়ের বাস্‌কেট্— কালক্রমে কখনো যদি বেণু স্কুলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পায় তখন ওর সৎ কাজে লাগ্‌বে—আর, সেই সঙ্গে একখানা আদর্শ নীতিগল্পগুচ্ছ— একেবারে চতুর্থ সংস্করণ!

আর আমি? মণ্টুর মাষ্টার? ফুট্‌বলের দৌড়? বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্থপ্রাপ্তি? পঞ্চাননের অশ্বমেধ? উঁহু, নিজের বই-টই একেবারেই নয়, এমন কি, প্রেমেনের বইও না—

একখানা কঠোপনিষৎ কেবল!

আত্মার চরম উন্নতি যদি হয় তো ওতেই হবে।

পরশু শুক্কুরবার দিন যথাসময়ের লোক-মারফতে জোয়ারদার-মশায়ের গৃহে এগুলি রপ্তানি করবার সুব্যবস্থা করে' তবে আমরা চায়ের দোকানে ফিরতে পারি।

উপহারের তালিকার আলোচনা করে' আমরা আনন্দে উল্লসিত হচ্ছি—চায়ের পাত্ররাও উচ্ছ্বসিত—এমন সময়ে জোয়ারদার মশাই প্রবেশ করেন আবার।

"এই যে! ভালো, তোমরা সকলেই রয়েছ—" অমায়িক ভাবে তিনি বল্‌তে সুরু করেন: "বাড়ী ফিরে গিন্নীর সঙ্গে কথা কইলাম। বাস্তবিক্, বেণুর জন্মদিনটা অম্‌নি অম্‌নি যেতে দেওয়া ভালো দেখায় না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি ঐ মেয়ে! ভোজটোজ গোছের —পার্টি-টার্টি যাই বলো—একটা কিছু হওয়া উচিত! পাড়ার ছেলেমেয়েদের সব নেমন্তন্ন করেছি—সকাল বেলায় তারা আস্‌বে; তোমরা সন্ধ্যের দিকে এসো—কেমন?"

বলা বাহুল্য, তুমুল উৎসাহসেই আমরা নেমন্তন্ন গ্রহণ কর্‌লাম।

উপহার-তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে, এই ভোজের ব্যাপারটা বেণুর কেমন লাগ্‌বে, তার প্যাঁচালো পলিটিক্যাল্ মনে কিরকম কাজ করবে, এইটাই আমরা ভাব্‌ছিলাম। জিঘাংসার পরিতৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটু মজার আমেজ্ লাগ্‌ছিল যেন আমাদের।

কিন্তু, শুক্কুরবার সন্ধ্যের দিকে, স-পরিবারে আমার তিনবন্ধু এবং বিনি-সমভিব্যাহারে স্বয়ং আমি যখন জোয়ারদার মশায়ের বাড়ী গিয়ে চড়াও হলাম, তখন উৎসব-আমোদের টুঁ শব্দটিও, ভেতরের থেকে, আমাদের কানে এসে পৌঁছল না।

চার ধার চুপ্‌চাপ্‌—নিঃসাড়, নিঝ্‌ঝুম্‌ একদম্‌। য়্যাঁ ? ভোজের ব্যাপারটা ভোজবাজির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো নাকি ?

কড়া নাড়্‌তেই দরজা খুলে গেল। বিজ্ঞাপনের চিন্তিত মা'র প্রতিচ্ছবির মত জোয়ারদার-গিন্নি, খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকেই, নিঃশব্দে যেন বেরিয়ে এলেন।
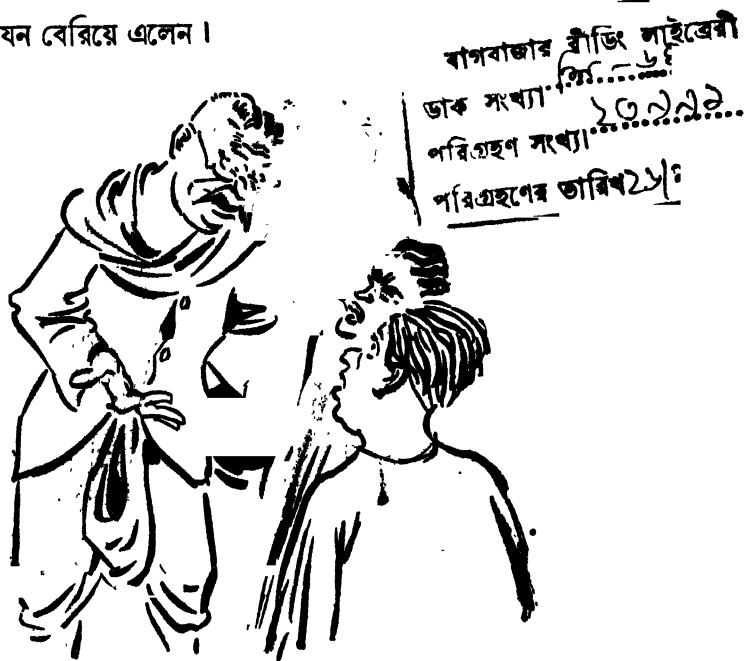
"দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি ঐ মেয়ে!"

"ভেতরে এসো।" ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বল্লেন : "হায়, বেচারী বেণু! ...ওর বরাত!"

"কেন, কী হোলো বেণুর ?" আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। যা ডান্‌পিটে মেয়ে!—কিছু না হওয়াই ওর আশ্চর্য্য।

"হাম হয়েছে। তবু এসো তোমরা। বড়দের তো হাম হয় না; ছোঁয়াচ্ লাগার ভয় নেই তোমাদের। তা ছাড়া, বেণু তোমাদের সব্বাইকেই দেখ্তে চেয়েছে। তোমরা যে-সব উপহার পাঠিয়েছ, দেখে ও ভারী খুসী—ওর যা আনন্দ!—"

বিবেক আমাদের দংশন করতে থাকে, বিছের মত বিছুটি লাগায়। আমরা বেণুর মার অনুসরণ করি! বেণুর শোবার ঘরে ঢুকি। ছোট্ট বেণু, বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসেছে, সারা মুখে লাল লাল গুটির দাগ। বিছানার চার পাশে আমাদের উপহারগুলো সুবিস্তৃত করে' বিছানো।

বেণু দু'একটা কথা বলে কোনো রকমে। আমরা সকলেই ওর ভালো-কাকাবাবু, সকলেই সমান উপাদেয়, আর, উপহারগুলোও ওর খুব ভালো লেগেছে, যদিও ও যা আশা করেছিল এগুলো তার ঠিক কাছাকাছি যায় না, তবু, ভালো হয়ে উঠে বইগুলো সে পড়বে। বিশেষ করে' হিতোপদেশটা তো বটেই। আর ঐ 'সমস্কৃত' বইটাকেও একবার চেষ্টা করে' দেখবে। ভালো হয়ে এবার সে খুব ভালো মেয়ে হবে কি না!

এই বলে' সে ভীতনেত্রে বুননের বাক্স আর বইগুলোর দকে একবার তাকায়।

আমরা কিন্তু তাকাতে পারি না। হিতোপদেশই কি, আর কঠোপনিষদ্ই কি, সব্বাই যেন আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ভেংচি কাট্তে থাকে। কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকে সবাই! বিবেকের দংশন আরো মর্ম্মন্তুদ হয়।

অগত্যা, এক্ষেত্রে যা কর্‌বার, তাই আমরা করি। পকেটের মধ্যে হাত পুরে দিই; গিন্নীরাও নিজেদের লেডিজ্‌ ব্যাগ্‌ হাত্‌ড়ান্‌—পাঁচ টাকা দশ টাকা যার কাছে যা ছিল ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে ফেলি।

বিনি তো তার কড়ে আঙুলের আংটিটাই দিয়ে বসে। আর-কোনো আঙুলে না লাগায় বেণুর বুড়ো আঙুলেই ওটা পরিয়ে দেওয়া হয়। তার পর বিনাবাক্যব্যয়ে আমরা বিদায় নিই।

বেণু হাসিমুখে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্যাখে। দ্যাখে কি দ্যাখায় সেই জানে!

পরদিন সকালে চায়ের দোকানে জোয়ারদারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আমার প্রশ্নাঘাত: "বেণু? বেণু কেমন? কেমন আছে বেণু?"

"ও, চমৎকার! বড় রাস্তায় ছুটোছুটি কর্‌ছে বোধ হয়। কিম্বা তোমাদের টাকায় ট্রাইসিকেল্‌ কিন্‌বে বল্‌ছিল, কারো সঙ্গে তাই কিন্‌তে গেছে হয়ত।"

"য়্যাঁ?...অসম্ভব!"

"না—না।" জোয়ারদারমশাই জবাব দ্যান্‌: "অসম্ভব না। হামই নয় আসলে। আমার গিন্নী ওর জন্যে একটা রঙের বাক্স এনে রেখেছিলেন—জন্মদিনে উপহার দেবেন বলেই এনেছিলেন। তাই দিয়েই, বুঝ্‌লে কিনা, ও এই হাম বানিয়ে বসেছে! তোমরা কাল চলে যাবার পর ডাক্তার এলেন, কেবল সাবান আর জলের সাহায্যেই তিনি ব্যারাম

সারাতে পারলেন! কী সাংঘাতিক দুষ্টু মেয়ে, ভাবো দিখি! পাড়ার ছেলেপিলেদের নেমন্তন্ন করেও হামের ছোঁয়াচের ভয়ে সরিয়ে দিতে হলো; ভোজটোজ বাদ গেল সব, ভাবো দিখি একবার কাণ্ডখানা!”

আমি কী একটা জবাব দিতে গেলাম, কিন্তু বেণুর ট্রাইসিকেলের সমুচ্চ ঘণ্টা-ধ্বনিতে কথাটা তলিয়ে গেল।

এবং কেবল ট্রাইসিকেলই নয়, ঐ সঙ্গে বেণু কিনেছে দেখ্‌লাম— একটা কান-ফাটানো বিউগিল্, একটা এয়ারগান্ (বোধহয় গুল্‌তির প্রমোশনে), একটা টিনের বাঁশী—এবং এক জোড়া খর্‌তাল্!

এই গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গেই—তার সবগুলোই আমি শুন্‌তে পাচ্ছি এখন।

কাল রাত্রে যাত্রা দেখে, হরিহরবাবু বেশ নাক ডাকিয়ে, অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন। বেশ একটু বেলা হল উঠ্‌তে। হাঁ, একটু বেলাই হল বইকি! অসম্ভব কিছু না। অত রাত্রি অব্‌ধি জেগে যাত্রা দেখ্‌লে কে না বেলা করে ওঠে! কাজেই এক্ষেত্রে হরিহর বাবুকে দোষী সাব্যস্ত কর্‌লে তোমাদের অন্যায় হবে।

যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন তাঁর দেয়াল ঘড়িতে দশটা বেজে পাঁচ মিনিট। ঘড়ির দিকে চেয়েই, হরিহরবাবু একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। দেখ্‌লে মনে হয় যেন তিনি হাইজাম্প প্রাক্‌টিস্ করছেন। তাঁকে এক্ষুনি অপিসে যেতে হবে। এক্ষুনিই! আর দেরী কর্‌লে আর চলবে না। ঠিক দশটায় তাঁদের অপিস। এদিকে নাইতে খেতেই ত প্রায় এগারটা বেজে যাবে। তার ওপর, ওদিকে তাঁদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার যা কড়া তা আর বল্‌বার নয়। লেট্ হলেই হয়েছে আর কি!

হরিহরবাবুর প্রথমে বিশ্বাস হোলো না। চোখ দুটোকে আবার ভাল করে' রগ্‌ড়ে নিয়ে, পুনরায় তিনি ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। না ভুল হবার যো নেই! কম তো দেখ্‌তে পেলেনই না, বরং কাঁটাটা

আরো যেন এগারটার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এও কি কখনও হয়? জীবনে এত বেলা করে তিনি কখনও ওঠেননি। বড় জোর আটটা। নয় তো ধরে নাও এই ন'টা—কিংবা সাড়ে ন'টা। এর বেশী কিছুতেই নয়, তা একেবারে তিনি হলফ্ করে', এমন কি, নাকখৎ দিয়েও বলতে পারেন। আজ যে কেন তিনি এত দেরী করে উঠলেন, তা তাঁর নিজেরই বোধগম্য হল না। প্রথমে তাঁর মনে হল—কেউ হয়ত ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ঘড়িটা সবারি নাগালের বাইরে বলে', সে-ধারণা একেবারেই তাঁর মন থেকে দূরীভূত হল। হরিহরবাবু ভাবতে থাকেন—ঘড়িটা হয়ত ফাষ্ট্ যেতে পারে, তাই সঠিক সময় জান্‌বার জন্যে তিনি রাস্তায় ছুট্‌লেন। রাস্তায় গিয়ে তাঁর মাথাটা আরো বেশী ঘুলিয়ে গেল। কোনোটায় সাড়ে দশ, কোনোটায় এগারোটা, কোনোটায় বা বারোটা পঞ্চান্ন! তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ছুটে এসে তিনি একেবারে মহাপ্রলয় সুরু করে' দিলেন। গিন্নীকে বল্লেন, "ভাত বাড়ো গিন্নী, বেলা হয়ে গেছে! এখুনি আপিসে যেতে হবে আমায়।" গিন্নী কি জানি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, তাঁর কথা না শুনেই কানে না তুলেই তিনি স্নানের জন্যে ছুট্‌লেন।

কোনো গতিকে আধ বাল্‌তি জল কোনরকমে মাথায় ঢেলে, কাপড় বদ্‌লাবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কাপড় আর কোথায়? সব ধোপার বাড়ী। ঐ একখানা যাও ছিল, তাও তিনি ভিজিয়ে ফেলেছেন। তাই না দেখে তো হরিহরবাবু একেবারে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়! এদিকে ঘড়িতে সাড়ে এগারো! সময় আর বেশী নেই বলে তিনি হাতের কাছে সন্তুর প্যাণ্ট্‌টা পেয়ে পরতে তৎপর হলেন। সন্তু বসে বসে হাতের

লেখা লিখছিল, দৌড়ে ছুটে এসে বাবাকে শাসিয়ে বল্লে, "বাবা! কর কি, কর কি! আমার নতুন প্যাণ্টটা ছিঁড়ে যাবে যে! হরিহরবাবু পুত্রের বাধা-বিপত্তি সব অগ্রাহ্য করে' কোনও রকমে প্যাণ্টটা পরে ফেল্লেন।
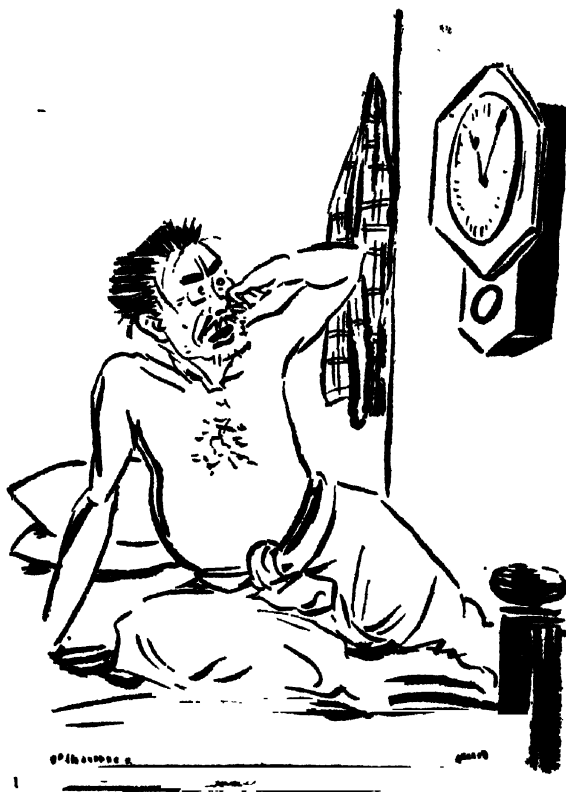
চোখ খুলে দেখ্‌লেন ঘড়িতে দশটা বেজে পাঁচ মিনিট্‌!

ভাত খেতে বসে, শুধু একগ্লাস জল খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি। তারপর জামার খোঁজ পড়্‌ল। জামাও কাপড়েরই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই আর কি করা! ক্যাব্‌লার খেল্‌বার জার্সিটা আল্‌না

থেকে হস্তগত করে নিজের দেহে কোন রকমে সেটাকে গলিয়ে দিলেন। জার্সিটা পরে তিনি বেশ একটু খুসীই হলেন। কেন না ওটা তাঁকে এমন সুন্দর মানিয়েছিল যে আর বলবার নয়! জার্সিটার চারিদিকের নানারকম রংগুলোয় বাহারটা আরো বেশী করে ফুটিয়ে তুলেছিল। এতদিনে হরিহরবাবু বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলেন যে কেন খেলোয়াড়দের অত সুন্দর দেখায়। এবার তিনি জুতো খুঁজতে ব্যস্ত হলেন কিন্তু জুতো আর কোথায় পাবেন! জুতো যে কাল রাত্রেই যাত্রা দেখতে গিয়ে তিনি হারিয়ে এসেছেন। অগত্যা আর উপায়ান্তর না দেখে হরিহরবাবু পল্টুর রবারের জুতোটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা ছিল—যে রবার টান্‌লেই বাড়ে, স্বভাবতঃই বেড়ে যায়, কিন্তু এ কি জুতো রে বাবা! এর তো এক ইঞ্চিও আর বাড়ছে না। এত টানাটানি করেও বাড়ানো যাচ্ছে না তো? অগত্যা নিজের এবং আর সকলের সহায়তায় টেনেটুনে কোনরকমে তাকে পদস্থ করে' তবে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালেন।

তারপর চুল আঁচড়াবার জন্যে আয়নার কাছে ছুট্‌তে হয়। চুল আঁচড়াতে গিয়ে, তিনি দেখ্‌তে পান্‌ দাড়িগুলো বেশ খোঁচা খোঁচা হয়েই বেড়িয়ে পড়েছে। এবং দাড়ি কামাবার জন্যে তক্ষুনি তাঁকে ব্লেড্‌ নিয়ে পড়তে হয়। সেফ্‌টি রেজার খুঁজে না পেয়ে কেবল ব্লেডের সাহায্যেই দাড়ি কামাতে লেগে যান্‌। তাড়াতাড়িতে ব্লেড্‌টি গালের ওপর দিয়ে যেমন তেমন ভাবে চালিয়ে নিজের গালকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলেন। এবং ঘড়ির দিকে নজর দিয়েই, আঁৎকে উঠে, তিনি পূর্ব্ববৎ হাইজাম্প করতে সুরু করে দ্যান্‌, "ওরে বাপরে, সাড়ে বারোটা! সর্ব্বনাশ! এযে একেবারে আড়াই ঘণ্টা লেট্‌!"

এবং পথে আরো লেট্ হবার ভয়ে তিনি মই দিয়ে ক্লকটি নামিয়ে না নিয়ে বগলদাবা করে বেড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন, এমন সময় রাম্বু একেবারে হ্যাঁচ্চো করে' এক বীভৎস রব ছেড়ে ছ্যায়, হাঁচির চোটে

"ক্যাব্‌লার জার্সিটা আল্‌না থেকে টেনে নিয়ে—"

বাবার বের হওয়াতে বিঘ্ন ঘটায়। হরিহর বাবু তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। যাবার মুখে বাধা পাওয়া তাঁর ধাতে সয় না। তিনি বেশ

বিরাশী সিক্কার একখানি থাপ্‌পর রানুর গালে কসিয়ে, দুর্গা দুর্গা বলে' বেরিয়ে পড়েন। রাস্তায় বেরিয়েই, তিনি স্থির করেন—আজ আর হেঁটে যাওয়া নয়। ট্রামেই যাবেন তিনি। তা না হলে আরো লেট্‌ হবার ভয় আছে! হরিহরবাবুর এরকম অদ্ভুত বেশভূষা দেখে ট্রামের সহযাত্রীরা বেশ একটু অবাক্‌ হল। কেউ হয়ত তাকে বহুরূপী বলে ভুল করে বসল। কেউবা ভাব্‌ল পাগল, কেউবা দ্বিতীয় গোষ্টপাল। ট্রামের কণ্ডাক্‌টার একটু ভয়ে ভয়েই টিকিটের পয়সা প্রার্থনা করল।

হরিহরবাবু মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে জার্সির পকেট এবং রবারের জুতোর সুখ্‌তলা অবধি পয়সার জন্য অন্বেষণ করলেন। কিন্তু পয়সা আর কোত্থেকে মেলে? পয়সা তিনি তাড়াতাড়িতে আন্‌তে ভুলে গেছেন। কণ্ডাকটার এবার হরিহরবাবুকে ঘড়ি এবং ঘাড় ধরে নামিয়ে দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু হরিহরবাবু নাম্‌তে একেবারে নারাজ। যাকে বলে পাদমেকং ন গচ্ছামি।

হরিহররাবু এবার কণ্ডাক্‌টারকে বলেন, "বলি, তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ যে তোমরা আমায় গাড়ী থেকে নামিয়ে দিতে চাও? এখন আমার কাছে একটি আধ্‌লাও নেই। তাড়াতাড়িতে আন্‌তে ভুলে গেছি। এখন আমি অফিসে যাচ্ছি—ভারি তাড়া। আজ না হয় কাল দেবো। তারজন্য আর কি? তোমার পাঁচটা পয়সা মেরে দিয়ে পালাব না। ভয় নেই। পাঁচটা পয়সাইত? এমন আর কি যে না নিলেই নয়! এমনও নয় যে তোমাদের এতবড় কোম্পানী তাতে করে' ফেল্‌ হয়ে যাচ্ছে?"

কণ্ডাক্‌টার হরিহরবাবুর কথায় কোনো আমল না দিয়ে, এবং আমোদ না পেয়ে, হরিহরবাবুকে সত্যি সত্যি ঘড়ি এবং ঘাড় সমেত ধরে নামিয়ে দেয়। তিনি মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হন্। তিনি বুঝতে পারলেন না যে, কোম্পানীর রাজত্বে, কেন তাঁর ওপরে এতটা অত্যাচার করা হল। তারপর তিনি আর এক মুহূর্ত্তও না অপেক্ষা করে, ফুল্ স্পীডে, অফিসাভিমুখে ধাবিত হলেন। বল্‌তে গেলে রাস্তার লোককে তাক্ লাগিয়ে, হক্‌চকিয়ে দিয়ে, ছুটতে লাগলেন তিনি। হাঁপাতে হাঁপাতে হরিহরবাবু অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু অফিসে তো গেলেন, অফিস খোলা নেই কেন? অফিসের দরজা বন্ধ কেন—য়্যাঁ? রাতারাতি ওরা লালবাতি জ্বাল্‌ল নাকি?

তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল—ঐ যাঃ! আজ রোব্‌বার যে! রোব্‌বার যে আজ!

একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস লিখ্‌লে হয়। আমার জীবনে এই ধরণের একটা 'য়্যাম্‌বিশন্‌' অনেক দিন ধরেই ছিল। কিন্তু কি করে' যে ওই সব লেখে, গল্পচ্ছলেই যদিও, যাতে করে' অদ্ভূত আর বিচ্ছিরি যত কাণ্ড—যার মাথা নেই মুণ্ডু নেই—একটার পর একটা ঘটে যায়··· পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ঘট্‌তে থাকে—কৌতূহল আর অনিদ্রা সমান তালে জাগিয়ে রেখে ধারাবাহিকভাবে গড়াতে থাকে, কিছুতেই আমি ভেবে উঠ্‌তে পারি নে। সত্যি, ভাব্‌তে গেলে, আশ্চর্য্য নয় কি? প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এসেই নাস্তানাবুদ্‌ হয়ে পড়ো, এর পরে, এরও পরে, আরো কী দুর্ঘটনা ঘট্‌বে, ঘটতে পারে, ধারণা করতেই তোমার মাথা ঘুরবে—এবং পরের পরিচ্ছেদের গোড়াতেই যখন ব্যাপারটা আরো একটু খোলসা হবে, তখন আবার আপনমনেই বল্‌বে হয়তো: "দূর্‌ দূর্‌! এই! এর জন্যেই য়্যাতো!"

কিন্তু সে যাই হোক্‌, য়্যাড্‌ভেঞ্চারের একটা বই লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা, অতি দুরূহ আকাঙ্ক্ষা, আমারও ছিল! কিন্তু কি করে' যে মাথা

খাটিয়ে ওই রকমের একটা গল্প ফাঁদা যায় কিছুতেই ঠাওর করে উঠ্‌তে পারছিলাম না।

সেই-আমারই জীবনে যে এমন এক রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার ঘটবে কে জান্‌ত! একেবারে সত্যিকারের য়্যাড্‌ভেঞ্চার, গল্পের বইয়ে ঠিক যেমন-যেমনটি ঘটে, মাথামুণ্ডুহীন নিখুঁৎ রকমের হুবহু! কেন যে হোলো, কি জন্যে যে হোলো, এমন কি কী যে হোলো, তার কিছুই আমি খুঁটিয়ে বল্‌তে পারব না। কোথায় যে হোলো তাও আমার কাছে ধোঁয়াটে।

সেই য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কেবল একটি পরিচ্ছেদই আমি জানি, সেইটিই আমি এখানে বিবৃত করব। তার আগে কী ঘটেছে, এবং পরেই বা কী ঘটিতব্য—আমার জানা নেই। জানার বাসনাও নেই। এই একটি মাত্র পরিচ্ছেদই আমার জীবনে ঘটেছিল, অথবা, সেই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য য়্যাড্‌ভেঞ্চারের এই পরিচ্ছেদটি যখন ঘটছিল, সেই অশুভমুহূর্ত্তে, আমার জীবন নিয়ে আমি হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম—এবং, সুখের কথা যে, জীবন নিয়েই ফিরতে পেরেছি।

বেশী দিন আগের কথা নয়, বিশেষ এক জরুরি কাজে ডায়মণ্ড হার্‌বারে যেতে হয়েছিল। ইচ্ছে করেই লাস্‌ট্‌ বাস্‌-এ চেপেছিলাম, যতই ঢিমে তেতালায় চলুক্‌, রাত দুটো তিনটে নাগাদ্‌ গিয়ে পৌঁছতে পারব। মনে মনে একটু য়্যাড্‌ভেঞ্চারের লালসাও যে না ছিল তা নয়! কল্‌কাতার বাইরে কখনো তো পা বাড়াই নে। রাত দুপুরের পর ডায়মণ্ড হার্‌বারের মত এক অচেনা জায়গায় উৎরে, বন্ধুর বাড়ী খুঁজে বের করে', চৌকিদার-পুলিস-ইত্যাদির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে, কড়া

নাড়ানাড়ি করে' কিংবা দরজা ভেঙেই, বন্ধুকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলা—বেশ একটুখানি য়্যাড্‌ভেঞ্চারই বই কি!

বাস্‌-এ আমি একাই যাত্রী।

হুস্ হুস্ করে' বাস্ চলেছে। কলকাতা পেরিয়ে অনেক দূর এসেছি বেশ বোঝা যায়! অন্ধকার রাতের ভেতর দিয়ে উত্তাল হাওয়ায় পাড়াগেঁয়ে মেঠো গন্ধ ভেসে আসছে; দু'ধারে কোথাও আম বাগান, কোথাও বা বাঁশঝাড়, কোথাও চষা ক্ষেত, কোথাও বা খোড়ো ঘরের বস্‌তি—আব্‌ছায়ার মতো চোখে এসে লাগে। এরই মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে ভীষণ এক ঝাঁকুনি দিয়ে বাস্‌টা থেমে গেল হঠাৎ।

কল বিগ্‌ড়েছে, গাড়ী আর চল্‌বে না, জানা গেল। আজকের মতো এইখানেই নিশ্চিন্দি!

নিশ্চিন্দি? বল্‌তে কি, বেশ একটু ভয়-ভয়ই কর্‌তে লাগ্‌ল আমার। অজানা জায়গায়, নির্জ্জন নিশুতিতে কেবল মাত্র ঐ ড্রাইভার্ আর এই কণ্ডাক্‌টার্—ওদের কণ্ডাক্ট্ অথবা ড্রাইভ্ অকস্মাৎ কী দাঁড়াবে কে বল্‌বে? ওধারে ষণ্ডা-গুণ্ডা ওই দু'জন, আর এধারে নামমাত্র আমি—আমার রীতিমত হৃৎকম্প সুরু হোলো।

অবিশ্যি, নিজেকে আশ্বাস দিতেও কসুর কর্‌লাম না। তেমন ভয়ের কিছু না, সত্যিই হয়তো কল বিগ্‌ড়েছে। বেগ্‌ড়াতেও তো পারে। বেগ্‌ড়ায় না কি? পথে-ঘাটে আক্‌চার্‌ই তো মোটরের কল বেগ্‌ড়ায়—না বলে' কয়েই বিগ্‌ড়ে যায়। কেবল স্থান-কাল-পাত্র তেমন সুবিধের নয়, আমার মনের মত নয় বলেই কি আর মোটরের কল বেগ্‌ড়াবে না? বেশ তো আমার আব্‌দার!

তা ছাড়া, এমনও তো হতে পারে যে ড্রাইভারের বেজায় ঘুম পাচ্ছে, গাড়ী টান্‌তে আর রাজি নয়—এবং ঘুম পায় না কি মানুষের ? মোটর চালাতে পেলেও ঘুম পেতে পারে।

"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্—!"

কিম্বা, সব চেয়ে যেটা বেশী সম্ভব, এতটা পেট্রল্-খরচায় একজন-মাত্র আরোহীকে ঘাড়ে করে' ডায়মণ্ড্ হার্‌বার পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে

চলে মজুরি পোষাবে না, তাই ভেবে বুঝে-সুঝেই মোটরের কল বিগ্‌ড়েছে হয়তো—

"গাড়ী ফের চল্‌বে কখন ?" জিজ্ঞেস্ কর্‌তেই, আমার শেষের আশঙ্কাটাই যে সত্য, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম।

জবাব এল ঃ "সেই কাল সাতটা-আটটায়। সকাল না হলে' কোন্‌খানকার কল বিগ্‌ড়েছে জান্‌ব কি করে' ?"

"এই রাত্রে—এত রাত্রে তা হলে তো ভারী মুস্কিল !"

"কাছেই একটা বে-সরকারী বাংলো আছে। সেইখানে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিন্‌গে—গেলেই শুতে দেবে। আর রাতও তেমন অন্ধকার নয়। চাঁদ উঠে গেছে এতক্ষণে।" কণ্ডাক্টার্‌টা জানাল।

চাঁদ উঠেছে বটে। সরু এক ফালি চাঁদ—চাঁদের অপভ্রংশই বলা যায় ! অন্ধকারও অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে দেখ্‌লাম।

"কোন্ ধারে বাংলোটা ? যাবো কোন্ দিক্ দিয়ে ?"

"রাস্তা থেকে নেমে, চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলে যান্। আল্ ধরে' ধরে' যান্ চলে'। একটু গিয়ে, সাম্‌নের ঐ বাগানটার আড়ালেই বাংলোটা। বাবুর্চ্চিকে ডাক্‌বেন। লোকটা ভালো—বক্‌শিস্ পেলে এত রাত্রেও উঠে রেঁধে দেবে। বাংলোর মালিকও খুব ভদ্রলোক—তাঁর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।"

কেবল শোবার জায়গাই নয়, খাবারও ব্যবস্থা রয়েছে। বাসের কল বিগ্‌ড়ে ভালোই হয়েছে বল্‌তে হবে।

একেই বলে বরাত ! না চাইতেই বর পাওয়া !

যাক্, বাস্ থেকে নেমে রওনা তো দিলাম। চষা জমির ওপর

দিয়ে, খানাখন্দে না পড়ে, হাত পা না ভেঙে, আল্ এবং টাল্ সাম্‌লে, কোনোগতিকে, কেবলমাত্র আকাশের চাঁদের সাহায্যে সেই বাগান-ঘেঁষা বাংলোয় গিয়ে তো উত্তীর্ণ হলাম।

ভেবে কাহিল হচ্ছিলাম, অনেক ডাকাডাকি কর্‌তে হবে, বন্ধুর জন্যে যে প্ল্যান্ আঁটা ছিল, বাবুর্চির ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে হয়তো, কিন্তু না, কাছাকাছি হতেই বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বল্‌ছে এবং দরজাটাও খোলা, দিব্যি চোখে পড়্‌ল!

আস্তে আস্তে দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—গলা খাঁকারি দেব কিনা ভাবছি—এমন সময়ে—ও—মা!—

ভয়ানক এক দৃশ্য আমার চোখের সাম্‌নে উদ্ঘাটিত হোলো!

ঘরের মাঝখানে, খাটে বসে', সেই বাংলোর মালিকই হয়তো—অতিকায় একজন মানুষ, যেমন হৃষ্ট তেমনি পুষ্ট, তবে হৃষ্ট খুব বোধ হয় বলা যায় না—তবে যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—পাক্কা তিন মণের কম নয় কিছুতেই। শুধু একটি চুল বাদে সারা মাথায় তার টাক্—সেই চুলটিই কেবল খাড়া হয়ে রয়েছে। তার ডান্ চোখের ওপরে কালো একটা ছোপ্ এবং ডান্ হাতের পিঠে উল্‌কি দিয়ে হরতনের টেক্কা আঁকা।

এবং তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর একটা মুশ্‌কো লোক, তার হাতে রিভল্‌ভার্। দোর-গোড়াতেই দাঁড়িয়ে।

আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজার আড়ালেই। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম বলাই ঠিক। মাটিতে হটাৎ এঁটে গেলাম যেন।

সেই তিনমণী লোকটা বল্‌ছিল: "দ্যাখো, আমাকে মারাটা তোমার ভালো হচ্ছে কি? আমায় মেরো না। এখনো আমার

বয়েস আছে, দাঁতও রয়েছে; খুব বুড়ো হয়ে পড়ি নি এখনো, এখনো আমায় বাতে ধরে নি। চোখে ছানি না পড়তেই মারা পড়ব, সেটা কি খুব ভালো দেখায়? বলো, তুমিই বলো! তুমি তামাসা করছ, ঠাট্টা করছ, নয় কি? সত্যি সত্যি মারছ না আমায়? য়্যাঁ?"

পিস্তল হাতে লোকটি খক্ খক্ করে' একটু হাস্‌ল—হাস্‌ল কি কাস্‌ল বলা শক্ত—"হ্যাঁ, মারব না! তাই বই কি! এত কাণ্ড করে' এত কষ্ট করে' শেষটায় তোমাকে না মেরেই চলে' যাই আর কি! 'অমাবস্যার আর্ত্তনাদ' বইটা তুমি পড়োনি তাই এই কথা বলছ! 'ধরো আর মারো'—সেই বইটাও তোমার না পড়াই রয়ে গেছে মনে হচ্ছে! কিন্তু কি করব, এ-জীবনে তুমি আর পড়বার ফুরসৎ পাবে না—আমি নাচার!—নাও, প্রস্তুত হও।"

এই বলে' তিনমণী সেই লোকটাকে প্রস্তুত হবার, কিম্বা দ্বিতীয় কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই—"গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুম্!"

সেই মুশ্‌কো লোকটার হাতের পিস্তলটা বাক্যব্যয় করতে সুরু করে' দিল।

তিনমণী লোকটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এবং আমিও ধুপ্ করে' বসে পড়লাম, সেইখানেই।

পিস্তলহস্ত লোকটার নজর আমার দিকে পড়ল এবার।

"কে হে? তুমি আবার কে এসে জুটলে হে এখানে? গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নও তো!"

"আজ্ঞে না।" ভয়ে ভয়ে বলি—বেশ সবিনয়েই: "এম্‌নি এসে পড়েছি। একেবারেই দৈবাৎ! এম্‌নি এসে পড়ে না কি

মানুষ? গল্পের বইয়েও তো এসে পড়ে—বহুৎ পড়া গেছে—আপনার ঐ বই দুটোতেও কত বার এসেছে দেখতে পাবেন। তবে যদি বলেন, অনুমতি করেন যদি, তা হলে' এখান থেকে চলে যেতেও পারি। এক্ষুনি যেতে পারি। সেবিষয়ে আমার খুব অনিচ্ছা নেই—হ্যাঁ, চলে' যেতে বল্‌লেও নিতান্ত অপমানিত বোধ করব না—" বল্‌তে বল্‌তে আমি উঠে পড়ি।

"উঁহুঃ, সেটি হচ্ছে না। যখন এসেই পড়েছ তখন—"

তার অঙ্গুলি-হেলনে—পিস্তল-হেলনে বল্‌লেই যথার্থ হবে—আবার বসে পড়তে হয়।

"তাহলে যদি আপনার অভিরুচি হয়, নেহাৎ আপত্তি না থাকে,—" আবার আর্জ্জি সুরু হয় আমার: "আপনি আমাকে মার্‌লে মার্‌তেও পারেন। ঐ পিস্তল দিয়েই মার্‌তে পারেন। আমার তেমন খুব অরুচি নেই। যদিও আমার দাঁত পড়ে নি তবে বাত ধরেছে কিনা বল্‌তে পারব না। তবু যে-কারণেই হোক্, বাঁচতে আমার আর উৎসাহ নেই। বেঁচে কি হবে? বেঁচে লাভ? আপনার উল্লিখিত ঐ-বই-দুটো আমি পড়েছি। এই সেদিনই তো পড়লাম। তাই পড়বার পর থেকেই আমার বাঁচবার স্পৃহা লোপ পেয়েছে। সেই বই থেকে জানা যায়, এ-রকম স্থান-কালে মারাই উচিত, এবং মরাটাই বাঞ্ছনীয়,—এ-রকম সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয়া ঠিক নয়। আপনারও না, আমারও না। একবার ফস্‌কালে আর আস্‌বে কি না কে জানে! এরকম কটা আসে জীবনে? এরকম অবস্থায় মর্‌লে, মরতে পার্‌লে, কেউ না কেউ

আমাদের এই য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ লিখে ফেলবেই, আর, মরে' অমর হতে কে না চায় ? তার ওপর, মেরে হতে পারলে তো আর কথাই নেই !"

"উঁহু, মরা অত সহজ নয় হে, ফাজিল্‌ ছোক্‌রা ! অমর হওয়া অত সস্তা না। ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি ? যেখানে আছ সেইখানে চুপটি করে' বসে' থাকো। আমাকে ভাবতে দাও আগে। একরাত্রে একটা খুন্‌ই যথেষ্ট কিনা, ভেবে দেখি। যদি মনে হয় আরো একটা হলে' নেহাৎ মন্দ হয় না তখন না হয় তোমাকে দেখা যাবে। 'হত্যাহাহাকার' বইটা তুমি পড়েছ নাকি ? ওটাতে এক রাত্রে ক'টা খুন্‌ ছিল ? ও-বইটা আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু বাজারে পাই নি, কার লেখা তাও জানি নে। কার লেখা জানো ?"

"আজ্ঞে, আমি লিখি নি। য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ আমার বড় আসে না।"

"ফের বাজে কথা ? অমন করলে, কথার ওপর কথা বল্‌লে—ও রকম বাজে বক্‌লে, খুন্‌ না করেই,—হ্যাঁ, বলে' দিচ্ছি, খুন্‌ না করেই গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব তোমায়,—সোজা তাড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন। অমর হওয়ার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করে' দেব,—হুঁ।"

ভয় পেয়ে আমি চুপ্‌ মেরে গেলাম !

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌।

মুশ্‌কো লোকটা আপন মনেই বল্‌তে থাকে হঠাৎ: "আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় ? এর মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে সেই কাটা মাথাটা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে গিয়ে প্রেজেণ্ট করলে কেমন হয় ? ষ্ট্রেট্‌ একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে ? কোনোও য়্যাডভেঞ্চারের বইয়ে এ

রকমটা ঘটেছে কি ? ওহে—ও ! পড়েছ নাকি হে কোনোও বইয়ে ?”

আমাকে উদ্দেশ্য করেই হাঁক্-ডাক্ তা বেশ বুঝতে পারি। অগত্যা বলতে হয় : “ঘটা আর বিচিত্র কি ! এ রকম তো ঘটেই থাকে। না পড়লেও, বলে’ দিতে পারি।”

“আঃ, বড্ড তুমি বাজে বকো। বল্ছি না যে আমায় বকিয়ো না। ভাব্তে দাও আমায়।”

এর পর সেই হত্যাকারী ভদ্রলোক একেবারেই ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হলেন।

ভেসে উঠলেন সেই ভোরবেলার দিকে। বাবুর্চ্চি এসে পড়তেই ভেসে উঠতে হোলো। বাবুর্চ্চির হাতে ব্রেক্ফাস্টের ট্রে, তাতে রুটি, মাখন, চা, ডিম—স্বর্গীয় মোটা লোকটির জন্যই আনা হয়েছিল বেশ বোঝা যায়। — দরজার বাইরে ঐভাবে-বসানো আমাকে এবং দরজার ভেতরে সেই মুশ্কো লোকটিকে দেখেই বাবুর্চ্চির মুশ্কিল্ ঠেকেছিল, তার ওপরে, অস্ত্রশস্ত্র, খুন্খারাপি ইত্যাদির আম্দানি দর্শন করে’ চায়ের ট্রে ফেলে দিয়ে পিঠটান্ দেয়াই যথোচিত হবে কিনা চিন্তা করছিল বেচারা, এমন সময়ে সেই হত্যাকারী হঠাৎ হাহাকার করে’ ওঠে : “হয়েছে হয়েছে, ইউরেকা ! নিয়ে এস।”

পিস্তলচালিত হয়ে বাবুর্চ্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব্রেক্ফাস্টের ট্রে সেই মুশ্কো লোকটির সম্মুখে এনে ধরে’ দেয়, এবং নিজে এগিয়ে ধরাশায়ী সেই তিনমণীর পাশে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

“এই কথাই ভাবছিলাম। এই টোসট্-রুটির কথাই ! খুন্

তো করলাম, কিন্তু তার পরে আর কি করা যায়, এতক্ষণ ধরে' সেই কথাই ভাবছিলাম। এই তো চমৎকার একটা হাতের কাজ রয়ে গেছে! বাঃ! বাঃ! বেশ বানিয়েছ তো টোস্‌ট্‌গুলো। ডিমসেদ্ধও নেহাৎ মন্দ করো নি তো!—"

বাম হস্তে পিস্তল ধারণ করে' সেই মার্‌খুনে মানুষটা ডান্ হাতের সদ্ব্যবহার সুরু করে' দ্যায়।

আমিও সেই তালে একটু ফাঁক্ পেতেই সরে পড়ি সেখান থেকে।

ছুট্! ছুট্!! ছুট্!!! একেবারে সেই বড় রাস্তায়—চায়মণ্ড হারবার্ রোডে। কিন্তু কোথায় বা সেই বাস্! কাকস্যপরিবেদনা! সদ্য-উত্থিত একজন প্রাতঃকৃত্যকারীর কাছ থেকে থানাটা কোন্ দিকে জেনে নিয়ে আবার দৌড় লাগাই।

মাইল দেড়েক দৌড়ে পৌঁছলাম গিয়ে থানায়। এক ছুটেই উঠলাম গিয়ে থানার উঠোনে।

বাংলোর মালিককে বাংলোর মধ্যেই খুন করে' রেখেছে, এক্ষুণিই তদন্ত করবার জন্যে, দারোগাকে খবরটা জানানো দরকার। হন্তদন্ত হয়ে, এখুনি গেলে—এখনো গেলে, হাতে-নাতে খুনেটাকে পাক্‌ড়ানো যায় হয়তো।

পাহারোলার ইঙ্গিতে বুঝলাম, দারোগা বাবু আপিস-ঘরেই।

এক লাফে ধাপ ক'টা টপ্‌কে দরজা ঠেলে আপিস-ঘরে ঢুক্‌লাম।

ঢুকে কী দেখ্‌লাম? দেখ্‌লাম কী?

দেখ্‌লাম দারোগাবাবুটি যেমন লম্বা তেম্‌নি চওড়া—বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—পাক্কা তিন মণের কম যান্ না, ঐ পেল্লায় চেহারা নিয়ে তাঁর

চেয়ারে গ্যাঁট্ হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর ডান চোখের কাছটায় কালো ছোপ্‌, এবং ডান্ হাতের পেছনে সবুজ উল্‌কিতে একটা টেক্কা মারা!

হরতনের টেক্কা!

কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার, ভদ্রলোকের দেহে প্রাণ নেই— পিস্তল দিয়েই কে যেন তাঁকে নিঃশেষ করে' গেছে স্পষ্টই বোঝা যায়। সোজা তাঁর বুকের ভেতর দিয়েই গুলি চালিয়ে দিয়েছে। কী অন্যায়!

আর হ্যাঁ, তাঁরও সারা মাথায় ঝাড়া টাক্, শুধু একটি মাত্র চুল খাড়া দাঁড়িয়ে??—

আমাদের খুড়োর ভারী সখ পাখী পোষা। বেজায় সখ বলা যায়। কেবল পোষাই নয়, দু চারটা বুলি শেখানোর দিকেও তাঁর ঝোঁক্ রয়েছে। জীবনে ছেলেমেয়েদের ওপরে মাষ্টারি করতে পারেন নি, কিন্তু মনের ক্ষোভ আর কতোদিন মনের মধ্যে চাপ্‌বেন ? রথের মেলায় দেখ্‌তে পেয়ে হঠাৎ একটা কাকাতুয়া কিনে ফেল্লেন।

কিনেই তাঁর ভাবনা হোলো, পাখীটাকে ভিড়ের ভেতর থেকে বার করে' কি করে' বাড়ী নেওয়া যায়!

অনেক ভেবে শেষে এক কাজ কর্‌লেন। একটা সুতোর গুল্‌তি কিনে ফেল্লেন মেলায়। পাখীটার পায়ে গুলি-সুতো বেঁধে, শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে, তিনি সুতোর গোড়া ধরে' আগাতে লাগ্‌লেন! কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি আস্‌তেই, পাখীটা এক ঝাপটে সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। হাতের অত বড়ো সুতোটা একটুখানি হয়ে গায়ের ওপরে পড়ে যেতে দেখে খুড়ো তো হতভম্ব! খুড়ো বল্লেন, "বাপু পাখী, তোমার তো কোনো ক্ষতি করিনি, তবে কেন আমাকে এমন করে' ফাঁকি দিয়ে গেলে! ভালোর জন্যেই তোমাকে সুতোয় বেঁধে

হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আস্‌ছিলাম, কিন্তু এটা কি তোমার খুব ভালো হোলো? ভালো হোলো বাপ্‌?"

খুড়োর জীবনে সেই প্রথম পাখীর সূত্র-পাত!

পাখীটাকে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে চল্লেন!

সূত্রপাতে হতাশ হলেও, হাল্‌ ছেড়ে দেবার পাত্র নন্‌ খুড়ো। আবার তিনি মেলায় ছুট্‌লেন। আরেকটা কাকাতুয়া কিন্‌তে। এবার

পাখীটাকে কিনে, আর গাঁট্‌ছড়া বাঁধাবাঁধি নয়, সটান্ একেবারে নিজের ভুঁড়ির মধ্যে, জামার অন্তরালে বন্দী করে' নিয়ে চল্লেন। এদিকে জামার চাপে আর ভুঁড়ির তাপে পাখীটার তো দম বন্ধ হবার যোগাড়! কি করে বেচারী! প্রাণের দায়ে, ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে, জামার গায়ে ফুটো করে' একটা ভেন্‌টিলেটার্ তৈরী করে' ফেল্‌ল। তাঁর নতুন জামার গায়ে জানালা বসে গেছে খুড়ো তা জান্‌তে পান্‌নি, বাড়ীর কাছাকাছি যখন এসেছেন, পাড়ার একটা হিংসুটে ছেলে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। দেখেই তো তিনি হাঁউ মাঁউ করে' ককিয়ে উঠলেন। যেই না জামা তুলে পাখীটাকে হাতিয়ে ফেল্‌তে যাবেন, চেষ্টা করেছেন কেবল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফুরুৎ!

খুড়ো এবার পাখীর ব্যবহারে ভারী মর্ম্মাহত হয়ে পড়্‌লেন। পাখীর উদ্দেশে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বল্লেন, "বাপু, এটা কি তোমার ভালো হোলো? তোমাকে জামার ভেতরে করে' জামাই-আদরে বাড়ী নিয়ে আস্‌ছিলুম, কিছুতো দুর্ব্ব্যবহার করিনি, বরং খুব কাছে, ভুঁড়ির কাছাকাছিই, ব্যবহার করিছি, অথচ তুমি কিনা এক দাপটে একেবারে ব্যবহারের বাইরে চলে গেলে! কোথায় যে উড়ে গিয়ে জুড়ে বস্‌লে তুমিই জানো! বুঝতে পারছি, পাখী জাতটাই নেমক্‌হারাম্!"

বার বার তিন বার! আবার তিনি মেলার দিকে ধাওয়া কর্‌লেন। এবার খাঁচা-শুদ্ধ কাকাতুয়া কিনে—পাছে আবার খাঁচা-সমেত চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় বলা যায় নাতো?—একেবারে একটা ট্যাক্‌সী করে' সোজা বাড়ী এসে হাজির হলেন। খাঁচা ভেঙে

ফের পালায় এই ভয়ে, এবার তিনি, ট্যাক্‌সিতে বসেও, খাঁচার চারধারে কড়া পাহারায় নিজেকে মোতায়েন্ রাখলেন।

পাখী তো বাড়ী এল, এবার স্বুরু হোলো খুড়োর পাখী পড়ানো! কাকাতুয়াকে নিয়েই খুড়ো দিনরাত ব্যস্ত। নাওয়া

"পড়ো বাবা রাধাকান্ত! পড়ে' ফ্যালো!"

নেই, খাওয়া নেই, কেবল শুধু পাখীর কানের কাছে, "পড়ো বাবা, রাধাকান্ত! রাধাকান্ত!" এক ঢিলে দুটো পাখী মারা খুড়োর মৎলব! পাখীকে ঠাকুর-দেবতার নামও শেখানো হবে, সেই সঙ্গে

পাখী অম্‌নি নিজের অগোচরে, তাঁকেও নাম ধরে' ডাক্‌তে শিখবে—আমাদের খুড়োর নাম রাধাকান্ত কিনা!

পাখীর পড়বার জন্যে আলাদা একটা ঘরই ঠিক্ হয়ে গেল। সে-ঘরে পাখী আর তার মাষ্টার—রাধাকান্তবাবু এবং তাঁর ছাত্র—তাছাড়া আর কারো ঢুক্‌বার অধিকার থাক্‌ল না। ঘরের দরজায় 'পাখী ব্যতীত অপর কাহারো প্রবেশ নিষেধ' লট্‌কে দিয়ে, ঘরের ভিতরে তিনি পক্ষী-রাজকে নিয়ে লট্‌কে রইলেন। আর কেবলই তাকে পড়াতে লাগ্‌লেন, "পড়ো বাবা, রাধাকান্ত! রাধাকান্ত! পড়ে ফ্যালো!—"

পাখীটা কান পেতে শোনে, মনোযোগী ছাত্রের মতো পড়া নেয়, রীতিমতই পড়া নেয়, কিন্তু পড়া দেবার তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। বেশী পীড়াপীড়ি করলে, পা তুলে নিজের মাথা চুল্‌কাতে থাকে, মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক্ করে, মুখ নাড়ে, যেন অতি কষ্টে স্মরণ করবার চেষ্টা করছে,—এই রকম ভাবখানা! আরেকটু হলেই যেন মনের থেকে, মুখের মধ্যে এসে যায়, আর তক্ষুনি পড়া দিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবে মাষ্টারের। ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে মাষ্টারের দিকে তাকায়—তাকাতে তাকাতে ফের আবার পা তুলে মাথা চুল্‌কাতে আরম্ভ করে।

রাধাকান্ত ধমক্ দেন, "ছিঃ, পড়্‌তে পড়্‌তে মাথা চুল্‌কায় না। ওটা ভারী অসভ্যতা। বলো, বলে ফ্যালো, লজ্জা কি?"

পাখীটা এবার অন্য পা তুলে মাথার অন্য ধারটা চুল্‌কায়!

রাধাকান্ত তখন আবার নতুন করে' পড়া দিতে সুরু করেন, পুরণো পড়া পারেনি, জেনেও তাকে নিষ্কৃতি দেন্ না, ফের আবার,

এবার বেশ ভালো করে’ তাকে পড়ান, — “পড়ো বাবা, রাধাকান্ত! রাধাকান্ত! পড়ো! কট্‌টুক্ আর পড়া? পড়্‌তে কতক্ষণ লাগে? মন দিয়ে পড়্‌লে কতক্ষণ আর? এক্ষুণি মুখস্থ হয়ে যাবে। পড়ো, ছিঃ, পড়তে পড়তে মাথা চুলকায় না! অন্যমনস্ক হয় না! ছি! তোমায় তো কোনো শাস্তি দিই নি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ষ্ট্যাণ্ড্ আপ্ আপন্ ওয়ান্ লেগ্ বলিনি তো! ভালো হয়ে বোসো, বোসে মন দিয়ে পড়া করো। পড়ো, রাধাকান্ত—রাধাকান্ত, পড়ো।”

পড়ার ঘরে দৈবাৎ যদি ছেলেপিলেদের কেউ এসে পড়েছে, তাহলে আর রক্ষা নেই। রাধাকান্ত তক্ষুণি রেগে অগ্নিশর্ম্মা,—“দূর্‌হ এখান্ থেকে, গাধারা সব! দেখছিস্ না এখন আমি কাকাতুয়াটাকে শেখাচ্ছি। তোরা এলে ও যাও শিখেছে সব ভুলে যাবে — ভুলে মেরে দেবে সমস্ত। একেইতো পড়ায় ওর মন বস্‌ছে না, গাধাদের একটু যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে! গাধা বলে’ গাধা, সাধে তোদের আমি গাধা বলি! এক নম্বরের গাধা সব!”

বিকেল বেলা পাখীটাকে নিয়ে, খাঁচা সমেত নিয়ে, ছাতে তিনি হাওয়া খান্। তখন আর পড়ানো নয়, বেড়ানো কেবল। মাথায় হাওয়া লাগলে, যদি কাকাতুয়াটার একটু মাথা খোলে, স্মৃতিশক্তির একটু খোল্‌তাই হয়।

সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে আবার তিনি সেই পড়াবার ঘরে। আবার তিনি পড়াতে এবং পড়া নিতে বসেন। দুবেলাই তাঁর টুইশানি —এক বেলাও তাঁর কামাই নেই। জল-ঝড়, রেণি ডে, কিছুই বাদ যায় না! এমন কি, অনেক সময়ে, দুপুর রাত্রে, ঘুম থেকে উঠে

কাকাতুয়ার কানের কাছে গিয়ে বলেন, "কহ রাধাকান্ত! রাধাকান্ত? রাধাকান্ত কহ! বুঝেচ বৎস?" কোথায় যেন তিনি শুনেছিলেন যে ঘুমন্ত অবস্থায় পাখীরা আরো ঢের ভালো শুন্তে পায়, আর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সব মনের মধ্যে গেঁথে যায় তাদের।

এম্নি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, রাধাকান্তর পাখী পড়ানো চলে!

অবশেষে, একদিন পাখীটার গলা থেকে আওয়াজ বেরয়—না, তার মাতৃভাষা নয়—তার পিতৃ-ভাষাই বটে—ক্যাঁ ক্যাঁ বুলি ছেড়ে সোজা সাধু ভাষাই বেরিয়ে আসে যেন।

"পড়ো-পড়ো—পড়্র্-র্-র্-র্—" বাংলা করে' বলে পাখীটা! বল্বার চেষ্টা করে।

রাধাকান্ত আহ্লাদে আট্খানা হয়ে ওঠেন,—"বলো! বলো! ভয় কি! পাশ কর্লেই মেডেল্ পাবে, কেলাসের তুমিই ফার্স্ট্ বয়্—এই বাড়ীর সব ছেলের মধ্যেই, হ্যাঁ, — বলো — বলো, — কি বল্ছিলে বলে' ফ্যালো লক্ষিটি!"

"গ-গা-গা-গা-গাধাকান্ত! গাধাকান্ত! পড়্-র্-র্-র্-র্!"—

পাখীটা বলে, মাষ্টারের দিকে কটাক্ষ করে' বলে। মাষ্টারকে সম্বোধন করেই বলে কিনা বলা যায় না।

কি করে’ শরীর গরম রাখা যায়, সেই এক সমস্যা। গ্রীষ্মকালের কথা নয়, শীতের দিনের কথাই আমি বল্‌ছি।

যখন শীতকাল জাঁকিয়ে আসে, সারা রাত হিম পড়ে, সব সময়েই হাড়-কন্‌কনানো বেধড়ক্ ঠাণ্ডা—কী করে’ শরীর গরম রাখা যায় এ-সমস্যা সেই সময়েরই। এবং, এই বিষয়ে, এই বিষয়টিতেও, অনেকের চেয়েই আমি যে একটু বেশীই জানি, আমার স্বভাব-সুলভ-বিনয় সত্ত্বেও সেকথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

অবিশ্যি, ইচ্ছা করলে আমি, একেবারে গোড়া থেকে, রক্ত থেকেই সুরু করতে পারি। না, রক্তপাত নয়, রক্তারক্তির ব্যাপার নয় কিছু, কেবল আমাদের রক্তের মধ্যে, লোহিত কণিকারা কোন্‌গুলি, তাদের সংখ্যা কত, স্বাতন্ত্র্যই বা কোথায় এবং কার্য্যকারিতাই বা কি কি—শরীর গরম রাখার পক্ষে এদের কোনো উপযোগিতা আছে কি

মা—সেই সব নিয়ে এখান থেকেই সুরু করা যায়। তাছাড়া, মিষ্টি জিনিসই বা আমাদের কী কাজে লাগে, চিনির সঙ্গেই বা দৈহিক উত্তা-পের কী ঘোরতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তা নিয়েও আরম্ভ করা যেতে পারে।

কিন্তু তা আমি করব না। কারণ, তাহলে আর আমি নিজেকে থামাতে পারব না! এ-প্রবন্ধ শেষ করে' উঠ্‌তে পারব না কোনো কালেই।

এ-বই-ও-বই-সে-বই থেকে, এই বিষয়ে, নানা মুনির নানা মত সংগ্রহ করে' স্বয়ং আমি, যে-মৌলিক সিদ্ধান্তে এসেছি, সেইটাই আমি সংক্ষেপে তোমাদের জানাব কেবল।

প্রথমেই, আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল কুসংস্কার রয়েছে, সেগুলি দূর করে' ফেলা উচিত। আমাদের ধারণা যে, ঘরের দরজা-জানালা ইত্যাদি চেপে বন্ধ করে' রাখ্‌লেই, ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মোটেই তা নয়! নির্ম্মল বাতাস সেবন না কর্‌তে পারলে গরম থেকেই বা কী লাভ? খুব খুঁটিয়ে ভেবে দেখ্‌লে, আসলে, তা গরম থাকাই নয়! চিরকালের মত ঠাণ্ডা হবার পথ পরিষ্কার করা, বল্‌তে গেলে। ধরো, চোদ্দ ফুট্ বাই চোদ্দ ফুট্ একটা ঘর, তার সব দরজা জানালাই যদি চেপে বন্ধ করে' দাও, একটু ফুটোও ফাঁক না রাখো, তার ফল কী হবে? খানিক বাদেই সে-ঘরের বাতাসে, থাকবে খালি নাইট্রোজেন—কিম্বা—হাইড্রোজেনও থাকতে পারে—সঠিক আমি বলতে পারছি না। তবে অক্সিজেন্ যে একেবারেই নয়, সে কথা জোর গলাতেই বলতে পারি। আর অক্সিজেনই হচ্ছে আমাদের নিঃশ্বাসের প্রধান উপজীবিকা, তা নিয়েই আমরা কোনো

গতিকে বেঁচে থাকি। অন্ততঃ, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের এই মত।

অতএব, যদি সত্যি সত্যিই গরম থাকতে চাও, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়দের লঙ্ঘন না করেই, তাহলে, দরজা জানালা সমস্ত অবাধে

কুস্তির ধাক্কায় যদি একেবারেই না ঠাণ্ডা মেরে যাও—

উন্মুক্ত করো। আগাপাশ্‌তলা খুলে দাও ওদের। এধার-ওধার দুধারেরই। ঢুকুক্ ঠাণ্ডা হিম, ঢুকুক্ কন্‌কনে বাতাস—একধার দিয়ে ঢুকে আরেক ধার দিয়ে বেরিয়ে যাবে ; ভয় কি ?

শীতকালের দিনে গরম পোষাক পরাও আরেক হাস্যকর বদভ্যাস! বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, গরম থাকবার জন্যে, গায়ে গুচ্ছের কাপড় জড়ানো কোনো কাজের কথাই না। কোট্, ওয়েষ্ট-কোট্, সোয়েটার, পুল্ওভার, ওভারকোট্, আলোয়ান্, কম্বল, বালাপোষ—এসব জড়িয়ে কী হয়? এভাবে জর্জ্জড়িত হয়ে, এতে কি সত্যি সত্যিই আমরা গরম থাকি? উঁহু। ও তো গরম থাকার ছলনা মাত্র। আসল উষ্ণতা আসে রক্তের চলাচল থেকে, সেইদিকে—শোণিতের সেই ধাবমান চাঞ্চল্য, সেই শাণিত দ্রুতগতির দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

এমন কি, উনুনের কাছে বসে' আগুন তাপিয়েও কোনো লাভ নেই। ওতে, যেমন শরীরের একধারটা একটু তাতে, তাত্তে থাকে, অন্যধারে তেম্নি আবার আরো শীত-শীত লাগায়। কোনো ফল নেই, পণ্ডশ্রম কেবল!

হ্যাঁ, যা বল্ছিলাম, রক্তের চলাচল,—সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখ্তে হবে। নিজের দেহে উষ্ণতা সঞ্চার করতে হলে, নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকে তা' লাভ করাই যথার্থলাভ। সেজন্যে রক্তের চাল্চলন্কে দ্রুতগামী করা চাই এবং রক্তকে আরো বেশী চঞ্চল, আরো সক্রিয়, আরো ধাবমান করবার জন্যেই দরকার হচ্ছে ব্যায়ামের।

আমি বল্বার আগেই, না বল্তেই, তোমরা তা ধরতে পেরেছ, নিঃসন্দেহ। ব্যায়ামের কথা কে না জানে? তার উপকারিতাই বা কার [illegible] বলো?

কী কী ব্যায়াম করা চল্‌তে পারে, তারই একটা ফিরিস্তি আমি এখানে দিচ্ছি : মোটামুটি, শরীর গরম রাখ্‌বার জন্যেই এসব ব্যায়াম :

(ক) শীতকালের দিনে, খুব সকালে উঠেই—এই ভোর পাঁচটা নাগাদ্‌—সব প্রথমেই ভর্ত্তি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল। তার মধ্যে বরফের কুচি ফেলে খেতে পারলে আরো ভালো! (অবিশ্যি যদি চাখ্‌তে পারা যায়। শীতকালে বরফ খুব সস্তা, বলাই বাহুল্য)।

(খ) তারপর লম্বা এক হাঁটন্‌ দাও—পাক্কা দশ মাইলের। একটা হাফপ্যাণ্ট আর আধখানা ঢিলে শার্ট গায়ে দিয়ে। দশ মাইলের আগে থাম্‌বার কথা নেই, তবে মাঝে মাঝে ছুট্‌ দিতে পারো।

এর ফলে, সেই শীতের দিনেও, তোমার দেহে বেশ উষ্ণতা যাতায়াত করছে, দেখতে পাবে। এমন কি, ঘেমে ওঠাও সম্ভব।

(গ) তারপর ফিরেই, এক গেলাস, বেশ ঠাণ্ডা ঘোলের সরবৎ—বরফ তার মধ্যে আছেই! এই হোলো গিয়ে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌। তারপর খোলা মাঠে গিয়ে, শিশির-বিস্তীর্ণ ঘেসো-জমির ওপর আধঘণ্টাটাক্‌, আর কিছু না, কেবল ডিগ্‌বাজি খাও। অল্পক্ষণেই দেখবে সর্ব্ব শরীর যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

(ঘ) তারপরের কাজ হচ্ছে, কাছাকাছি কুস্তির আখড়ায় গিয়ে ঢুঁ মারা। একজন পেশাদার কুস্তিগির ভাড়া করে' তার সঙ্গে খানিকক্ষণ দলাই-মলাই চালানো, শরীরের গরম চালু রাখার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদুপায়। তার চট্‌কানো, তার ঘুষি, তার র‍্যাদা, তার দ্বারা দলিত মথিত হওয়া, কী যে আরামদায়ক! এক কথায়, কুস্তির মত উপাদেয় ব্যায়ামই আর নেই। কুস্তির ধাক্কায় যদি একেবারেই ঠাণ্ডা মেরে না যাও, তাহলে,

কুস্তি সেরে তুমি নবজীবন লাভ করেছ বলেই তোমার সন্দেহ হবে। মনে হবে সে-তুমি আর নেই! একেবারে নতুন মানুষ! এমন কি, এত নতুন যে আয়নায় নিজেকে দেখে তুমি চিন্‌তেই পারবে না। যেমন নতুন তেম্‌নি টাট্‌কা—যেমন টাট্‌কা তেম্‌নি গরম!

(ঙ) তারপরে — তারপরে আর কি? বাগানে গিয়ে মাটি কোপাও। মাটি পড়েই রয়েছে। চারধারেই এন্‌তার্‌ ছড়ানো! যত চাও! এতেও শরীর বেশ গরম থাকে। এবং মাটি-কোপানোটা লাভজনক কাজেও লাগানো যেতে পারে। এখানে ওখানে আজে বাজে যা তা কুপিয়ে কোনো ফল নেই। বরং একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে, একগুঁয়ে হয়ে মাটি কোপাতে কোপাতে, সুড়ঙ্গ করে', সটান্‌ চলে' যাও — না, ঠিক্‌ টাঁক্‌শালের দিকে নয়, ব্যায়ামকে অতটা লাভজনক করা হয়ত সমীচীন হবেনা — তবে যদৃচ্ছাক্রমে যদ্দূর ইচ্ছা চলে যেতে পারো। এই ধরো, সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত? কিম্বা, অষ্ট্রেলিয়া? অষ্ট্রেলিয়াই বা মন্দ কি?

যখন অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌঁছবে, তখন দেখ্‌বে, তোমার শরীরে অদ্ভুত একটা উষ্ণতার সমাগম হয়েছে। খুব আশ্চর্য্য নয়!

গরম থাকার আরো অনেক চমৎকার চমৎকার উপায় তোমাদের আমি বাৎলাতে পারি, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, স্বাস্থ্যমূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমস্ত বই রয়েছে আমার পাশের ঘরে। সেখানে যাবার একটু অসুবিধাই আছে। না, ঘরটা তেমন ড্যাম্পো নয়, এবং জানালা টানালাও রয়েছে, আঁট-সাঁট করে' বন্ধ করাই আছে, তবে কিনা, সমস্ত জড়িয়ে, জানালাগুলোর তিনটে খড়্‌খড়ি ভাঙা! একেবারে নেইই

বল্‌তে গেলে—। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে হুড়্‌হুড়্‌ করে' যা হাড়-জমানো বাতাস্‌—বাব্‌বাঃ! ভাব্‌তেই আমি ভির্‌মি খাচ্ছি!

আর যা সর্দ্দি লেগেছে ভাই, কি বল্‌ব! হাঁচ্‌তে হাঁচ্‌তেই প্রাণটা গেল। আমার হাঁচির আবার অদ্ভুত ধরণ; একেবারে আন্‌কোরা কায়দা; আরম্ভ হলে আর থাম্‌তেই চায় না, চলেছে তো চলেইছে, একটানা ধাপা-মেলের মতো এক নাগাড়ে। প্রায় পাঁচশো হাঁচি হয়ে তারপর থাম্‌বে। তার আগে নয়।

আমি নিজে ঠাণ্ডায় কাতর বলে' তো তোমাদের উপদেশ দিতে কার্পণ্য কর্‌তে পারিনে, পরের ভালো করতে তো বাধা নেই। পৃথিবীর উপকার তো কর্‌তেই হয়? হয় না কি? প্রাণ দিয়েই করতে হয়। তবে কি না, আপ্‌নি বাঁচলে তারপরে পৃথিবী! আমায় খুব তাড়াহুড়ো লাগালেও, ওরে বাবা, ঐ ভাঙা-খড়্‌খড়িওলা পাশের ঘরে কিছুতেই আমি পা বাড়াবো না। মেরে ফেল্লেও না।

ব্যায়াম? ব্যায়ামের কথা বল্‌ছ? ব্যায়াম কর্‌ব কি, এপাশ-ওপাশ করাই আমার পক্ষে অস্থির কাণ্ড! ব্যায়াম আর ব্যারাম, আমার কাছে এখন এক বানান্‌!

ফ্ল্যানেলের শার্টের ওপর সোয়েটার লাগিয়ে, গরম কোট্‌ গায়ে এঁটে, বিছানায় শুয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে, বালাপোষ জড়িয়ে, তার ওপরে আলোয়ান্‌ মুড়ে—সবার ওপরে লেপের প্রলেপ তো রয়েছেই—শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, তোমাদের জন্যে এই প্রবন্ধটা লিখছি।

শীতকালটা ভাবছি, এইভাবে, এর মধ্যেই, এই জড়ভরত হয়েই কাটাতে হবে! কায়ক্লেশেই কাটাতে হবে। কী করব?

আত্মীয়দের অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য হরিহরবাবুর কোনোদিন হয়নি। দুর্ভাগ্যই বল্‌তে হবে, যদিও এটার জন্যে নিজেই তিনি দায়ী—তিনি নিজেই ইচ্ছে করে' কখনো কোনো আত্মীয়কে অভ্যর্থনা করতে যান্ নি।

সত্যি বল্‌তে কি, এতদিন সে সম্বন্ধে কোনো প্রেরণাই তিনি বোধ করেন নি। আত্মীয়রা আস্‌ছে, উড়ে আস্‌ছে, পাখা মেলে এসে ঘরদোর সব জুড়ে বস্‌ল আর কি, এই কথা ভাব্‌তেই হরিহরবাবুর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রি রি করে' উঠেছে।

কিন্তু আজ যেন একটু ব্যতিক্রম ঘট্‌ল। তাঁর এক আত্মীয় সপরিবারে কলকাতায় আস্‌চেন জেনে হরিহরবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁরা টেলিগ্রাম্ করেছেন—একজনকে ষ্টেশনে পাঠাবার জন্যে অনুরোধও জানিয়েছেন। হরিহরবাবু সহসা উত্তেজনা বোধ করলেন, কিন্তু আজ যেন কি রকম অন্য রকমের উত্তেজনা! আলাদা রকম ঠেক্‌তে লাগল তাঁর। কি রকম অন্য রকম যেন! আজ যেন একটু উৎসাহই তিনি বোধ করতে লাগলেন!

তিনি বল্লেন, "আমি নিজেই গিয়ে নিয়ে আস্‌ব ওদের।"

হরিহর বাবুর গিন্নী বাধা দিলেন—"তুমি আবার যাবে কি করতে? তাদের সেই কবে কোন্‌কালে দেখেছ, চিন্‌তেই পারবে কিনা কে জানে, তার ওপরে আবার ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে—"

হরিহরবাবু গিন্নীর বাধায় কান দেন্ না—"খুব চিন্‌তে পারব। লোক চিনে চিনে আমার চোখে চাল্‌সে হয়ে গেল! আমাকে আর লোক চিনিও না তুমি!"

"কাজ নেই তোমার ইষ্টিশনে গিয়ে। আমি বরং পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পঞ্চু কিম্বা শম্ভু যাক্ নাহয়—"

"পঞ্চু শম্ভুর কর্ম্ম নয়। এই হরিহর শর্ম্মা ছাড়া আর কেউ পারবে না বলে দিচ্ছি।"

গিন্নীও ছাড়বেন না, হরিহরবাবুও নাছোড়বান্দা। হরিহরবাবু গোঁ ধরে' বসেছেন, আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার সুযোগ কখনো তিনি পান্‌নি—এই মাহেন্দ্রযোগ ফস্‌কাতে, এদের হাতছাড়া করতে তিনি রাজি নন্।

হরিহরবাবুর জিদ্‌ই বজায় থাক্‌ল। কাউকে কোনো কথা বল্‌তে না দিয়ে, কারু বাধা-বিপত্তি না মেনে, একছুটে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। হেল্‌তে দুল্‌তে কোনো রকমে গিয়ে হাজির হলেন ষ্টেশনে।

ষ্টেশনে গিয়ে তো তাঁর চক্ষুস্থির! এ যে একেবারে মেলা গাড়ী! আর এধারেও জনসমুদ্র! একটা গাড়ী ছাড়ে তো তক্ষুনি আরেকটা এসে ভিড়ে যায়! কোন্ গাড়ীতে খোঁজ করবেন তিনি? চার পয়সার প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম টিকিট্ কেটে তো ঢুকেছেন—কিন্তু তারপর?

হরিহরবাবু ষ্টেশনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত—প্রত্যেক

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্য্যন্ত—তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। চারধারে চোখ চালালেন—চোখ এবং পা। যে-সব গাড়ী দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কর্‌ছিল, তাদের প্রত্যেক কাম্‌রাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ্‌লেন। বঙ্ক্‌ থেকে বেঞ্চির তলা পর্য্যন্ত বাদ দিলেন না। এমনকি যেসব গাড়ী তক্ষুনি ছাড়্‌বে তাদেরও তিনি ছাড়্‌লেন না।

গাড়ী-পরীক্ষা সমাধা করে' হরিহরবাবু প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের লোকদের পাক্‌ড়াতে সুরু করলেন। যাকে দেখ্‌তে পেলেন তাকেই ধরে' জিগ্যেস্‌ করতে লাগ্‌লেন, "মশাই, আপনার নাম কি বটকেষ্ট বাবু ?"

কেউ শুন্‌ল, শুনে ঘাড় নাড়্‌ল, কেউ শুন্‌লই না, কেউ না শুনেই চলে গেল, কেউ বা রুক্ষ গলায় বলে' গেল—"সাতপুরুষেও বটকেষ্ট নই।"

যারা উত্তর না দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল, হরিহরবাবু তাদের পেছন থেকে গিয়ে জাপ্‌টে ধর্‌লেন,—"বলুন্‌ না মশাই, বটকেষ্ট কি না আপনার নাম ?"

"বটকেষ্ট কি না, সে খোঁজে আপনার কি দরকার ? আপনাকে তো আমি চিন্নিনে মশাই ! কস্মিন্‌কালেও দেখিনি কখনো।"

"তাহলে আপনিই—তুমিই বটকেষ্ট ! ঠিক্‌ই হয়েছে !" আহ্লাদিত হয়ে হরিহর বাবু প্রায় কোলাকুলি করে' ফ্যালেন্‌ আর কি—"তা একটু দেরি হয়েছে আস্‌তে—দেরিই না হয় হয়েছে,—দেরি হয় না কি ? তা অত রাগ কর্‌ছো কেন ?"

ভদ্রলোক হরিহরবাবুর কথার জবাব না দিয়ে, অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখে, এবং আত্মীয়তার তোয়াক্কা না করে'—এমন কি, আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা না দিয়েই, গট্‌গট্‌ করে' সরে পড়েন !

"কোথাকার পাগল !" কেবল এই কথাটা হরিহরবাবুর কানে এসে ঝাপ্‌টা মেরে যায় !

"বটকেষ্ট চলে গেল !" মনক্ষুণ্ণ হরিহরবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে

"এই হরিহরশর্ম্মা ছাড়া আর কারু কর্ম্ম না !—"

বলেন, "রাগ করে' চলে গেল বটকেষ্ট। যাক্‌গে ! যেতে দাও ! দেখি আর কোনো বটকেষ্ট আছে কিনা এখানে।"

ওদিকের একটি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে এক ভদ্রলোক এক রাজ্যের ছেলেপিলে..

একগাদা লট্বহর, এবং এক পাল মেয়ের দঙ্গল নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, হরিহরবাবুর চোখে পড়্তেই তিনি হাতে চাঁদ পেলেন। এই তো বটকেষ্ট! বটকেষ্টই বটে! এহেন ব্যক্তি বটকেষ্ট না হয়ে আর যায় না! সদলবলে আস্ছে বলে' তার করেছিল না সে? হরিহরবাবু, সকলের হাঁ-হাঁ-র মধ্যে, কারু বাধা-বন্ধক না মেনে, রেল্লাইন্ ডিঙিয়েই ওধারের প্ল্যাটফর্ম্মের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলেন, ইতস্ততঃগামী শান্টিং ইঞ্জিন্দের, বিনা ভ্রূক্ষেপে, উপেক্ষা করেই তিনি এগুলেন।

"এই যে বটকেষ্ট! উঃ! এসে পড়েছ দেখছি! অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্তে হয়েছে? না? কি কর্ব, আস্তে দেরি হয়ে গেল, তারপর তোমাকে খুঁজে বের কর্তেই কি কম ঝঞ্ঝাট্ গেছে ভায়া!"

ভদ্রলোক হাঁ করে' থাকেন, "কাকে বল্ছেন? আমাকে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে নাতো আর কাকে! মেয়েছেলেদের আর এখানে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখোনা। একটা গাড়ী ভাড়া করে' ফেলা যাক্—কেমন? আমিই গাড়ী ঠিক কর্ছি, তুমি ইদিকে ততক্ষণ কুলী ডাকিয়ে মোটঘাটগুলো—"

ভদ্রলোক তথাপি উচ্চবাচ্য করেন—"আপনি কাকে বল্ছেন? আমাকে?"

"তোমাকে না তো আর কাকে! ওপাড়ার রামহরিকে নাকি? কঞ্জুস্ সেই রামহরিটাকে—যার নাম কর্লে অকালে হাঁড়ি ফেটে যায়? আমি গাড়ী ভাড়া কর্তে চল্লুম—ও হরি! গাড়ী কেন, আমি যে ষ্টেশনের বাইরেই একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। তাই তো! মীটারে ভাড়া উঠে যাচ্ছে, আর দেরি কোরো না বটকেষ্ট!"

"বটকেষ্ট কাকে বল্‌ছেন ?" ভদ্রলোক এতক্ষণে ক্ষীণস্বরে একটা প্রতিবাদ করেন—"আমার নাম তো বটকেষ্ট নয়। আমার নাম জগদ্ধাত্রীকুমার, আমার বাবার নাম কুলকুণ্ডলিনীকান্ত, আমার দাদার নাম হচ্ছে কাত্যায়নপ্রসাদ, আমার ঠাকুর্দ্দার নাম ছিল উপত্যকাশেখর আর আমার ছোটো ভাইয়ের নাম চন্দ্রিকাপ্রসাদ — আমাদের সব ইয়া ইয়া নাম! ছোট খাটো, বেঁটে সেটে ওসব বদ্‌নাম আমরা রাখিনে —তবে—হ্যাঁ—আমাদের কার পিস্‌শ্বশুরের নাম নটবর ছিল বলে' যেন শুনেছি—কিন্তু আমি তো কারু পিস্‌শ্বশুর নই!—"

শুনেতো হরিহরবাবু হতাশ! একটু বিরক্তও না হলেন যে তা নয়,—"যদি বটকেষ্ট নন্ তাহলে কেন আমাকে শুধু শুধু ভোগালেন? এতক্ষণ মিছি মিছি আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লেন কেন? আমার কতো ক্ষতি হয়ে গেল—দেখুন্‌তো! আসল বটোকেষ্ট হয়তো হারিয়ে গেল এই ফাঁকে—" বল্‌তে বল্‌তে তিনি দেখ্‌তে পেলেন, সপুত্র-পরিবারে অতীব স্থূলকায় এক ভদ্রলোক ষ্টেশনের চেকিংগেটের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে পার হচ্ছেন।

অম্‌নি তিনি ছুট্‌তে সুরু করলেন—"ওহে বটকেষ্ট! দাঁড়াও দাঁড়াও! দাঁড়িয়ে যাও হে! আমি এখানে—এই যে আমি এইখানে আমি!—ফিরে তাকাও! দাঁড়িয়ে যাও! শোনো!"

কিন্তু তিনি পৌঁছবার আগেই বটকেষ্ট সরে' পড়েছে, জনসমুদ্রে বুদ্‌বুদের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে পাত্তা নেই। তার টিকি খুঁজে পাওয়াই দায়! হরিহরবাবু হায় হায় করতে থাকেন—"এ বটকেষ্টটাও ফস্‌কালো! এটাও হাত ফস্‌কালো শেষটায়। শুদ্ধু ওই হতভাগাটার

জন্যে। উপত্যকাশেখরের খুড়ো—কাত্যায়নপ্রসাদের পিস্শ্বশুর সেই হতভাগাটার জন্যেই এটা খোয়া গেল কেবল!—"

দেখ্তে দেখ্তে আরেকটা গাড়ী এসে খাড়া হয় সাম্নের প্ল্যাট্ফর্মে। হরিহরবাবু নতুন বটকেষ্টর প্রত্যাশায় পুনরায় উন্মুখ হন্। গাড়ী থেকে, যে নামে, তাকেই তাঁর বটকেষ্ট বলে' সন্দেহ হতে থাকে, কিন্তু তিনি আর গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সাহস করেন না—পর পর যে-কটা চোট্ তাঁর ওপর দিয়ে গেছে তাই যথেষ্ট! —অবশেষে, পুত্রকলত্রসহ, একজনকে তাঁর সাম্নের কাম্রা থেকে নাম্তে দেখেই, তিনি আর স্থির থাক্তে পারেন না। এগিয়ে যান্ আপ্না থেকেই।

"এই যে তোমরা এসে পড়েছ দেখ্ছি! আর আমি এদিকে তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে পড়লাম!—" কিন্তু বটকেষ্ট বলে' তাঁকে সম্বোধন করতে তাঁর আর সাহস হয় না, কে জানে আবার যদি সেই চন্দ্রিকা প্রসাদের ভায়রা ভাইয়ের মতো হয়ে যায়। কি জানি ফের যদি ফিরে ধাক্কা লাগে, আবার যদি হতাশ হতে হয়, আগের আগেরবারের মতো শিকার অস্বীকার করে' বসে—দরকার কি ছাই—নাম গোত্র জেনে কাজ কি?—বটকেষ্টকে ছেলেপুলে সমেত ধরে' পাক্ড়ে, পালাতে না দিয়ে, বাড়ী নিয়ে যাওয়াটাই হোলো গিয়ে আসল।

"যাক্, আর দেরী কোরোনা! ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—" হরিহরবাবু এক নাগাড়ে বলেই যান্—"চলো আমাদের বাড়ী চলো। তখন সব কথা হবে! তারপর, তোমার শরীর ভালো তো? শরীর-

গতিক ভালো সব? ইস্ত্রী কেমন? তোমার কাজকর্ম্ম বেশ চল্‌ছে?"

বটকেষ্ট কিন্তু হরিহরবাবুকে গ্রাহ্য না করে', একরকম ঠেলে ফেলে দিয়েই, চলে যায়। তাঁর দিকে তাকাবার অবসরই পায় না সে।

হরিহরবাবু ভারী দুঃখিত হন্‌। বটকেষ্টদের এ রকম ব্যবহারে—বারম্বার এবম্বিধ দুর্ব্ব্যবহারে তিনি মনে মনে বিচলিত হন্‌। পৃথিবীটা তাঁর কাছে মরুভূমি বলে' বোধ হতে থাকে।

অবশেষে যখন তিনি সত্যিই হাল্‌ ছেড়ে দিয়েছেন, সেই শোচনীয় মুহূর্ত্তে, প্রায়-ফাঁকা-হয়ে-আসা প্ল্যাটফর্ম্মে, ছেলেপিলের লট্‌বহরসহ, একজন যেন তাঁর দিকেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বলে' তাঁর সন্দেহ হয়। এই তবে বটকেষ্ট! এতক্ষণ পরে হারাণো রতন পাওয়া গেছে তাহলে।

একলাফে তিনি তাঁর সাম্‌নে গিয়ে পড়েন। "এই যে বটকেষ্ট! এই যে আমি এখানে।—" বল্‌তে বল্‌তে তিনি এগিয়ে যান্‌।

"ও! আপনিই বটকেষ্টবাবু! আপনিই আমাদের নিতে এসেছেন? বটে?"

"আমার নাম হরিহর—" হরিহরবাবু একটু ভড়্‌কে যান্‌, "নাম বদ্‌লাচ্ছ কেন ভায়া?" কিন্তু তক্ষুনি তিনি সাম্‌লে নেন,—"ওঃ বুঝতে পেরেছি! ট্রেণের ঝাঁকুনিতে গুলিয়ে ফেলেচ। তোমার নাম বটকেষ্ট, আর আমার নাম হরিহর। যাক্‌গে, যেতে দাও, ওসব তুচ্ছ কথা থাক্‌! নামে কি যায় আসে? নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? বন্ধু, নামে কিবা করে? গোলাপ যে নামে ডাকো গন্ধ বিতরে!"

"আপনার সঙ্গে তো আমার ইয়ার্কির সম্পর্ক নয় বটকেষ্টবাবু!

আপনি নিয়ে যেতে এসেছেন, নিয়ে যাবেন। এত কথা কিসের ? এত কথা ভালো নয়তো ! আসল কথা বলুন বটকেষ্টবাবু, মোটর এনেছেন ?"

"ফের বটকেষ্ট ? বটকেষ্ট নয়—হরিহর। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি বুঝি ? যাক, বাড়ীতে গিয়ে চান্‌টান্ করে' মাথা ঠাণ্ডা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হারাণো স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে আবার। নাহয় একটা কবিরাজই দেখা যাবে এখন ! ভাবনা কি ?"

ভদ্রলোক এবার থতমত খান্—"আপনার নাম কি বল্লেন ? হরিহরবাবু ? বটকেষ্ট নয় নাকি ? তাহলে ভুল হয়েছে মশাই, মাপ করবেন, আমরা পটলডাঙ্গার বটকেষ্টকে খুঁজ্‌ছি।"

"তাহলে আমি সে নই—" হরিহরবাবু মুখ চুণ করে' বলেন—"আমি হ্যারিসন রোডের হরিহর সেন।"

"তাহলে মাপ্ কর্‌বেন, ভুল হয়েছে, কিছু মনে করবেন না।" বলে' উক্ত অ-বটকেষ্ট ভদ্রলোক চলে যেতে উদ্যত হন্।

হরিহরবাবুর তবু যেন কেমন লাগে—"আপনি ঠিক জানেন আপনি বটকেষ্ট নন্ ? ট্রেইন্ জার্ণিতে গুলিয়ে ফেলেন নি ঠিক বল্‌ছেন ? এদিক্-ওদিক্ করে' ফেলেন নি, ভালো করে' ভেবে দেখুন্ ? নাম ধাম গোলমাল হয়ে যায় নি তো — দেখুন একবার ভালো করে' মনে করে'—" হরিহরবাবু তবু একবার শেষ চেষ্টা করেন।

"উঁহু !" ভদ্রলোকের সেই এককথা। আলাদা কোনো কথাই নেই আর।

"খুব ভালো করে' ভেবে দেখুন।" হরিহরবাবু নাছোড়বান্দা, এতক্ষণ যুদ্ধ করে' হয়রাণ হয়ে, যদি বা তিনি একজন বটকেষ্টর সন্ধান

পেলেন, তাকে কোনোমতেই হাতছাড়া করতে রাজী নন্ কিছুতেই।

"না মশাই! আমি বটকেষ্ট নেই—আমার বেশ স্মরণ আছে। আমি আপনারই মতো সামান্য একজন বটকেষ্ট-প্রার্থী মাত্র।"
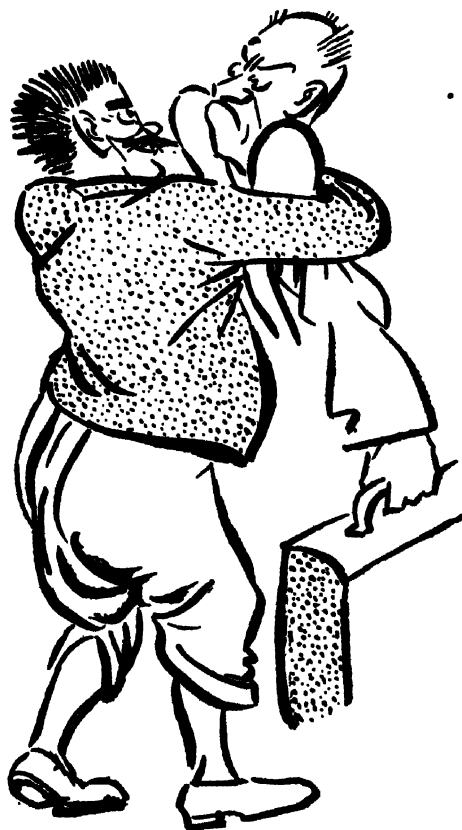
বটকেষ্ট-ব্যাপারে তিনি একদম্ নাছোড়বান্দা!

ভদ্রলোক চলে যান্—কিন্তু হরিহরবাবুর তবু সন্দেহ থেকে যায়।

পলায়মান বটকেষ্টর পেছনে পেছনে ছুটবেন কি না তিনি ভাব্তে থাকেন।

"ওহে বটকেষ্ট! ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?" এদিকে এসে শুনে যাও। গাড়ীর গোলমালে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি।" হরিহরবাবু হাঁক-ডাক্ ছাড়্তে থাকেন।

"ওহে! এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে—" তাঁর পেছন থেকে কে যেন বলে' ওঠে।

হরিহরবাবু চম্কে গিয়ে ফিরে তাকান্।—"য়্যা? কি বল্লেন?"

"এই যে আমি বটকেষ্ট, অনেকক্ষণ ধরে' তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি। আর তুমি ওধারে—"

হরিহরবাবু লজ্জিত হয়ে পড়েন—"কি করে' জান্‌ব তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? আমি এদিকে রাজ্যি-শুদ্ধ লোককে বটকেষ্ট-তাড়া করে' ফির্‌ছি! কতক্ষণ এসেছ? এক্‌লা কেন? ছেলেদের নিয়ে এলে না যে?"

"না, একাই এলুম্! বেশী দিনের ছুটি পেলুম না তো—কদিনের জন্যে লটবহর নিয়ে আর এত ছুটোছুটি পোষায় না! তোমাকে না পেয়ে ভাব্‌ছিলুম, কোনো হোটেলেই উঠ্‌ব না কি!—"

"না না! হোটেলে কেন? দিব্যি আমার বাড়ী রয়েছে!" হরিহরবাবু আত্মীয়তায় বিগলিত হয়ে পড়েন—"তারপরে বাড়ীতে তোমার উনি রয়েছেন—তোমার উনি—মানে—এই—আমার তিনি রয়েছেন—আদর-যত্নের তোমার কোনো ত্রুটি হবে না। চলো চলো, বাড়ী চলো আগে!

ট্যাক্‌সি করে আস্‌বার পথে, দুজনের সুখদুঃখের কত কথাই না হয়। বটকেষ্টর কটি ছেলে কটি মেয়ে, হরিহরেরই বা কটি মেয়ে কটি

ছেলে, কাদের বিবাহ দিতে পারা গেছে, কাদের বা কিছুতেই পারা যাচ্ছেনা—এইসব আলোচনায় দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা জমে ওঠে। হরিহরবাবু এতদিন আত্মীয়দের ভারী বিরোধী ছিলেন, ওঁর কিরকম ধারণা ছিল ওরা যেন মাথায় হাত বোলাবার ফিকিরেই ঘুর্‌ফির্‌ কর্‌ছে—কিন্তু বহুকালের বদ্ধমূল সে-ধারণা তাঁর আজ টলে গেল। সত্যি, আত্মীয়দের মতো পরমাত্মীয় কেউ নেই—আত্মীয়তার মতো দুনিয়ায় কিছু নেই আর!

বাড়ী ফিরে, বটকেষ্টকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে হরিহরবাবু অট্টহাস্য কর্‌তে কর্‌তে ওপরে ওঠেন—গিন্নীর কাছে যান্‌—কিন্তু কিছু বলবার আগেই—নিজের কীর্ত্তিকাহিনী গিন্নীর কাছে ব্যক্ত করবার আগেই—গিন্নী বাধা দিয়ে বলেন—"কেমন বলেছিলুম কিনা? যে তোমার কর্ম্ম নয়—অনর্থক হয়রান্‌ হবে কেবল! কেমন, নাস্তানাবুদ্‌ হয়ে ফিরে এসেছ—হয়েছে তো?"

"তা হয়রান্‌ একটু হতে হয়েছে বই কি। কিন্তু না হলে কি হয়? কষ্ট না কর্‌লে কি কেষ্ট মেলে?—" হরিহরবাবু বলেন—"যে-সে কেষ্ট নয় তার-ওপরে,—স্বয়ং বটকেষ্ট!"

"অনর্থক কষ্ট পেলে তো! যাক্‌, বটকেষ্ট যে বুদ্ধি করে' আস্‌তে পেরেছে সেই ভাগ্যি! নইলে কি কেলেঙ্কারিটাই না হোতো!" গিন্নী বলেন।

"আস্‌বে না কেন? আন্‌লে কে?" হরিহরবাবু বলেন—"কোন্‌ শর্ম্মারাম, শুনি? শেয়ালদার অত গাড়ীর ভিড়, অত লোকজন, তার ভেতর থেকে বটকেষ্টকে খুঁজে বার করা চারটিখানি কথা নাকি?"

"শেয়ালদা, শেয়ালদা কিগো ?" হরিহর-গিন্নী হতবাক্ হয়ে যান্।

"কেন, শেয়ালদাই তো !" হরিহরবাবু ততোধিক অবাক্ হন্।

"বোম্বেমেলের যাত্রীকে আন্‌তে গেছ শেয়ালদায় ? তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি ! বলি, বোম্বেমেল্ কি শেয়াল্‌দায় থামে ?"

"শেয়ালদায় থামে না ? বলো কি গিন্নী ? তবে,—তবে এ কোন্ বটোকেষ্টকে নিয়ে এলুম্ ? বাড়ী বয়ে কাকে আন্‌লুম আবার—য়্যাঁ ?"

"কোন্ বটোকেষ্ট আবার ! নিজে গিয়েই ছাখো না কেন ! আলাপ করোনা গিয়ে—আলাপ কর্‌তে দোষ নেই—আত্মীয়ই তো ! আমার আত্মীয় হলেই তোমার আত্মীয়। পর কিছু নয় ! ওইতো পাশের ঘরেই জলটল খাচ্ছে সবাই। বটকেষ্টর বৌ এসেছে, বটকেষ্টর পাঁচ ছেলে, সাত মেয়ে—"

হরিহরবাবু দৌড় ছ্যান্, কিন্তু ঠিক পাশের ঘরে নয়। নীচের তালায়। নবাবিষ্কৃত বটকেষ্টকে কিন্তু সেখানে আর দেখা যায় না। এবং সেই সঙ্গে—

দেখ্‌তে পান্‌না আরো অনেক জিনিস। কিন্তু সে দুঃখের কথা বলে' আর কি লাভ ? আত্মীয়রা ফাঁক্ পেলেই তাক্ কর্‌বে, এবং তাক্ পেলেই ফাঁক্ করে' যাবে—অনিষ্ট করবার জন্যই তাদের ঘনিষ্টতা-করা—হরিহরবাবুর চিরকেলে ধারণা।

তাঁর সেই ধারণাই আরো বেশী বদ্ধমূল হয়ে যায়। হরিহরবাবু আবার এখন সেই আগের মতোই সবার অনাত্মীয়—আত্মীয়তার ঘোরতর বিরোধী তিনি।

"না মশাই, এ রিপোর্ট চল্‌বে না। কবেকার পুরণো, পচা খবর কোত্থেকে কুড়িয়ে এনেচেন?"

এই বলে' দৈনিকের সম্পাদক রিপোর্টারের দিকে, টাইপ্-করা কাগজখানা ছুড়ে ফেলে ছ্যান্।

নাচার লোকটি কাগজটা কুড়িয়ে না নিয়েই ম্লান মুখে চলে যায়।

য়্যাপ্রেন্টিসির এই কয়দিনেই বেচারা নাজেহাল্ হয়ে পড়েছে। এতদিন বেকার বসে' থেকে, যদি বা একজন কাউন্সিলারের অনুগ্রহে একেবারে আকস্মিকভাবে, এই অপ্রত্যাশিত কাজটা পেয়েছিল—রিপোর্টারের য়্যাপ্রেন্টিসির কাজ—তাও বুঝি আর টেঁকে না। কাজটা করতে পার্‌লে—সম্পাদকের মনোমত পছন্দসই তাজা তাজা খবর যোগাড় করে' আন্‌তে পার্‌লে—চাক্‌রিটা পাকা হোতো। বেতনও পেত কিছু! প্রথম প্রথম খুব সরু থেকে সেই বেতনই ক্রমশ মোটা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যে না ছিল তা নয়। কিন্তু খবর যোগাতে হয়তো পার্‌লেও সম্পাদকের মন যোগানোই হয়েছে তার পক্ষে কঠিন!

একেই তো রিপোর্টারের মত ঝক্‌মারির কাজ কিছু নেই! রাত নেই—দিন নেই—খাওয়া নেই, না-খাওয়া নেই—খালি টই টই করে' ঘুরে বেড়ানো—কোথায় কে মর্‌ল, কে মরতে মর্‌তে বাঁচল, বা বাঁচ্‌তে

বাঁচ্তে মর্ল, কেউ হয়ত আবার মরে বাঁচল—কোথায় আবার হয়ত মেরে বেঁচে গেল—এইসব খবর যোগাড় কর্তেই তো সংবাদদাতার প্রাণ কণ্ঠাগত! তারপর সেইসব টাট্কা খবরগুলো যখন সম্পাদকের মতে বাসী, টকে-যাওয়া বলে' একে একে বাতিল হতে থাকে—

বাস্তবিক্, চুরি, ডাকাতি, পকেট-কাটি, রাহাজানি, খুন্, জখম্, মোটর-দুর্ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুঁজে পেতে, প্রাণ হাতে করে' যে-খবরই সে সংগ্রহ করুক্ না, এবং সেই খবর যেভাবেই, প্রাণ পায়ে করে', হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে খবরের কাগজের আপিসে এনে হাজির করুক্ না কেন, সম্পাদক মশাই এক নিঃশ্বাসেই সেসব নিঃশেষ করে' দ্যান্!

"জাহাজ-ঘাটায় এই একটু আগে দেখে এলাম একজন কাপ্তেন ক্ষেপে গিয়ে একটা বেড়ালের গলায় পাথর বেঁধে টান্ মেরে জলে ফেলে দিচ্ছে। এটা কি রকম খবর মনে করেন ? চলে কি ? কাপ্তেনের বিড়াল-বিসর্জ্জন কিম্বা বিড়ালের সলিল-সমাধি বলে' বড়ো বড়ো হেড্লাইনে ছাপানো যায় না—কী বলেন মশাই ?"

"সব পুরণো খবর! সমস্ত বাজে! একদম্ অচল সব! ঢের আগেই আমরা পেয়ে গেছি! ছেপে স্পেশ্যাল্ বেরিয়ে গেছে কতক্ষণ!"

সম্পাদক বলেন। এবং খুব মিথ্যে বলেন না। কেননা, স্খলিত-পদে, টল্তে টল্তে, খবরের কাগজের দপ্তরখানা থেকে বেরুতে না বেরুতেই 'হট্টগোলে'র এক পয়সানে সংস্করণ ওর চোখে পড়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, অলিতে গলিতে, হেঁকে ফির্ছে হকার্। এক পয়সা বর্বাদ করে' কিনেও পড়ে ও। সত্যি কথাই বটে! ওর যোগাড় করাই খবর যতো, এবং না-যোগাড় করাও কতো আরো—ঢের আগেই,

তার পৌঁছবার ঢের আগেই, আপিসে পৌঁছে, এসে, বেরিয়ে গেছে। সচিত্র হয়ে বেরিয়ে গেছে। হাতাহাতি হয়ে ঘরে ঘরে চলে গেল পর্য্যন্ত। সহরের কারোই জান্‌বার বাকী নেই এতক্ষণে! কানাকানি হয়ে এর মধ্যে কদ্দূর তারা চলে গেল কে জানে!

খবরটার সচিত্র সংস্করণ বেরিয়ে গেছে পর্য্যন্ত!

অবশেষে একটা খবর সে পায় বটে। খবরের মতই খবর। জবর খবরই বইকি! তাদের পাড়ার সেই কাউন্সিলার—যার দৌলতে তার ঐ অনাহারী চাকুরি পাওয়া—তিনি—সেই তিনিই বাড়ী বদ্‌লাচ্ছেন।

আজ ভোরের বেলায় ঘরের বার হয়েই, নিজের চোখেই এই অভাবিত দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করেছে। এখনো এ-খবর আর কেউ জানেনি, টেরও পায়নি — একটা কাক্ চিলও না, — সম্পাদক তো দূরে থাক্!

দাঁত না মেজেই, মুখে জল না দিয়েই দৌড়ল রিপোর্টার্। পড়ি কি মরি হয়েই ছুট্ মারল। এক ছুটে একেবারে সম্পাদকের গদিতে।

সম্পাদক সব শুন্‌লেন। স্থির কর্ণেই শুন্‌লেই। তারপরে মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—"হ্যাঁ, এতদিনে আপনি একটা খবর এনেছেন বটে, খবরের মতই খবর—বাস্তবিক্!—"

রিপোর্টার্ আপ্যায়িত হয়ে গলে' পড়ে—"বলুন্, আনিনি কি? এখন পর্য্যন্ত কেউ টেরই পায়নি—চেষ্টা কর্‌লে কী না হয়? বলুন্!"

"তা বটে! আপনার এ-খবর আপনার আর সব খবরকে টেক্কা মেরেছে, সেকথা ঠিক! আর সব খবর ছিল, হয়তো বা একবেলা, কি বড়জোর একদিনের বাসি — কিন্তু আপনার এ-খবর পাক্কা এক-মাসের—পচা বল্লে এর অসম্মান করা হয়—পচা নয়, ধসা—পাক্কা এক মাসের গলে-যাওয়া থস্‌থসে খবর! এর দুর্গন্ধে টেঁকাই দায়!—"

এই বলে' সম্পাদকমশাই নাকে রুমাল দ্যান্। তাঁর নিজের নাকে।

"আজ সকালে, এই একটু আগেই, ঘট্‌তে দেখলুম, আর আপনি বল্‌ছেন পাক্কা একমাসের বাসি?" রিপোর্টার্ আকাশ থেকে পড়ে।

"কবেকার খবর, মান্ধাতাকে জিগ্যেস্ কর্‌তে পারেন। কাউন্সিলার একমাস আগে যেদিন বাড়ী ছাড়বার নোটিশ দ্যান্ সেই দিনই এই খবর আমরা পেয়েছি। যে-মুহুরি নোটিশ-পত্র লিখেছিল তার কাছ থেকেই পাওয়া। আরো জান্‌তে চান্?"

রিপোর্টার্ আর বেশী জান্‌তে চায় না। জান্‌বার তার দুঃসাহস হয় না। সেও এবার নাকে রুমাল চেপে বেরিয়ে আসে। সত্যি, খবরটা

"উঃ, কী সব থস্‌থসে পচা খবর!" সম্পাদক নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেন।

এত পচা, এমন বস্তা-পচা যে ভাব্‌তে গেলেই নাকে ধাক্কা লাগে, ভাবনার দুর্গন্ধেই অজ্ঞান হতে হয়।

সেদিন বিকেলেই রিপোর্টার্ আসে আবার। ঘুরে-ফিরে ফের

আসে। আবার আসে সেই সম্পাদকের শিবিরে। উন্নত শিরে।

আজ সকালে চলে' যাবার আগে সম্পাদক বলে' দিয়েছিলেন: "তাজা খবর থাকে তো আন্‌বেন, নইলে আর এমুখো হবেন না।"

কড়া গলাতেই বলা হয়েছিল তাঁর।

চূড়ান্ত একটা তাজা খবর নিয়েই সে তাই এসেছে।

এর চেয়ে তাজা খবর এর আগে আর কোনো কাগজে বার হয়নি। মারাত্মক তাজা খবর যাকে বলে!

সটান্ সম্পাদকের কাছে গিয়ে সে হাজির হয়।

"কী? আবার কী মনে করে' এখন?" সম্পাদক-মশাই শুধোন, "রামচন্দ্রের আমলের কোনো খবর-টবর কিছু?"

"নাঃ, এবার একটা টাট্‌কা খবর, ভয়ানক টাট্‌কা, এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বল্‌তে কি!" রিপোর্টার্ জবাব ছায়।

"বলো কি?" সোজা হয়ে বসেন সম্পাদক। কৌতূহলে এবং আগ্রহে তাঁর নিশ্বাস ব্যগ্র হয়। "কী? কী শুনি?"

"খুন্!" গম্ভীর মুখে বলে রিপোর্টার্।

"খু-উ-ন্! বলো কিহে?" সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন— "কতোক্ষণ হয়েছে?"

"এই এক্ষুনি!"

"এক্ষুনি? কোথায়—হোলো কোথায়? য়্যাঁ?"

"এই যে এখানে!" গুরুতর মুখে রিপোর্টার্ জানায়—"এখানেই।"

"এখানে? আমার আপিসে? য়্যাঁ—বলো কি—" সম্পাদকের কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে জড়িয়ে যায়: "আমার আপিসে? কে—কে খুন্ কর্‌ল?"

"আমি নিজে—।" অবিচলিত স্বরে সে রিপোর্ট করে।

"য়্যাঁ? তুমি? তুমি—কাকে—কাকে আবার—খুন্ করলে—"
সম্পাদকের গলা থেকে আওয়াজ ভালো বেরুতেই চায় না।

"কেন, আপনাকে।—আপনাকেই।" এই বলে' রিপোর্টার পিস্তল

"তাজা খবরটা নিজের চোখেই যাতে দেখে যেতে পান্, মন্দ কি?"

বার করে—জাপানী টয় পিস্তল যদিও—কিন্তু তা বোঝা শক্তই—
"খবরটা চট্‌পট্ এইবার ছাপ্‌তে পাঠিয়ে দিন্। এবং আমার চাক্‌রিটাও
পাকা করে' দিয়ে যাবার হুকুম হোক্! কি জানি, কতক্ষণ আর
বাঁচ্‌বেন, স্পেশ্যাল্‌টাও স্বচক্ষেই যাতে দেখে যেতে পান্, মন্দ কি?"

রামহরিবাবুর অপব্যয়

বেশ ছিলেন রামহরিবাবু এতদিন! এর ওর ঘাড় ভেঙে খেয়ে দেয়ে—দিব্যি তাঁর চলে যাচ্ছিল। খাবার হলে আর কথা ছিল না,—খাবার কথা হলে তো কথাই নেই, খাবারের কথাবার্ত্তাও যদি তাঁর ত্রিসীমানা দিয়ে যেতো, অম্‌নি উনি তার ওপর গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌তেন। খাবার-দাবার শেষ করে' তার পরে তাঁর কথা!

কিন্তু আমাদের ভগবান চিরকালই রামহরির প্রতি ঈষৎ নির্দ্দয়। একটু সুখ-সুবিধা জুট্‌লেই, অম্‌নি কোত্থেকে একটা না একটা বিষম বিপদ এসে পড়্‌বেই। তাঁর সেই বিচ্ছিরি ব্যায়রামটার বেলাও ভগ্‌বানের এই একচোখোপনা দেখা গেছ্‌ল। নিশ্চিন্ত মনে, ভিটামিন্‌-সেবনের সদভিপ্রায়ে, সস্তামস্তায় কমলালেবুর দর কর্‌ছিলেন, বলা নেই কওয়া নেই, কোথ্‌থেকে এক ব্যাটা গাধা এসে—! সেবারের সে বিপদটা তো তাঁর ঘাড়ের ওপরেই এসে পড়েছিল!

এবং ঘাড়ের ওপর দিয়েই গেছে, ঘাড়ের ওপর দিয়েই কেটে গেছে বল্‌তে গেলে। ঘাড় কেটে দিয়ে, বল্‌তে কি! গাধাদের ক্ষুর তো কম ধারালো নয়, নাপিতদের চেয়ে কম নয় নেহাৎ!

কিন্তু এবারের বিপদটাই বা কম কি? এবং ভেবে দেখতে গেলে —রামহরিবাবু ভেবে দেখছেন—এবারেও সেই গাধার উৎপাত—কেবল এবার একটা গাধা নয় এই যা। একসঙ্গে একগাদা একেবারে— পায়ের সংখ্যায় কম্‌তি হলে কি হবে, মাথা-গুন্‌তিতেই যে মেরে রেখেছে!

রামহরিবাবু এবং নীরোদ! নীরোদকে দেখে তাঁর মনে হোলো, নীরোদ নয়ত, আস্ত একটা—

রামহরিবাবুর আপিসের বন্ধুরা পাকড়াও করেছে সবাই—"নাহে, রামহরি, ওসব চল্‌বে না। এবার একদিন খাওয়াতেই হবে তোমায়। নাহলে আমরা আর শুন্‌ছিনে।"

হাত ধুয়ে আঁচিয়ে বসে আছে যেন। আদ্যাখলা, খেতে পায় না যেন হ্যাংলারা!

নীরোদ টিপ্পনি কেটেছে সেই সঙ্গে — "পরের ঘাড় ভেঙে খাবার আদায় করতে বেশ লাগে, না? বেশ মজা, য়্যাঁ? কিন্তু এতদিন বাপু ঘুঘু দেখিয়েছ, এইবার ফাঁদটি ছাখো একবার। হুঁ-হুঁ, আমাদের এত-গুলিকে একসঙ্গে খাওয়াতে হবে। বিরাট এক ভোজ ফেঁদে ফ্যালো— কি ভাব্‌ছ মিঞা?"

রামহরিবাবু আজ মুখ চুণ করে' আপিস থেকে ফিরেছেন। তাঁর সমস্ত উৎসাহ উপে গেছে, বল্‌তে কি! তখন থেকে কেবলি তিনি বল্‌ছেন, নিজের মনে মনেই বল্‌ছেন — "য়্যাঁঃ, বলে কি? আমার বাড়ীতে ভোজ! মহা ফ্যাসাদে ফেল্লে দেখ্‌ছি এরা! লোকের সময় অসময় সুবিধে-অসুবিধে কিছু এরা ছাখেনা গো! কেবল লোক দেখ্‌তে পেলেই হোলো। অম্‌নি তাকে ছেঁকে ধর্‌বে। মাছির মতো — পাণ্ডার মতো ছেঁকে ধরবে গিয়ে। কী ওস্তাদ্ — বাব্‌বাঃ! ভারী পাজি!—" রামহরিবাবু মনে মনে শিউরে উঠেছেন।

পরদিন ভারি ভাবিত হয়েই তিনি আপিসে বেরিয়েছেন। আবার সেই আপিসের দলবল। "কী ভাব্‌ছ হে রামহরি? কদ্দুর এগুলো? য়্যাঁ? এখনো পাজার অর্ডার দাওনি? বলো কি হে? বলি, এরমধ্যে ভাবাভাবির কি আছে? নেমন্তন্ন করে' ফেল্লেই তো হোলো। তাহলেই তো চুকে যায়।"

"তাকি হয়? খাওয়ানোর একটা সময় অসময় আছে তো? এখন কি আর খাওয়ানোর সময়? সেরকম সুযোগ কই এখন? অন্য এক

সময়ে হবে'খন — এই ধরো — আমার বড়ো মেয়ের বিয়ের দিনে তোমাদের সবাইকে ধরে' খাইয়ে দেব নাহয়।"

"তোমার বড়ো মেয়ের বিয়ে! সে তো আর বারো বছরের আগে হচ্ছে না। সেদিন না তার অন্নপ্রাশন হয়েছে, শুন্‌লুম না?" নীরোদ ফোড়ন ছায়।

"এমন আর কি দেরি? কদ্দিন আর? কথায় বলে, মেয়ের বাড়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে উঠ্‌বে। পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে বিয়ের যুগ্যি! ভেব না তোমরা।"

"সেসব হচ্ছে না রামহরি। বাপু হে। এই রবিবারই আমরা তোমার বাড়ী ঘেরাও করছি। মনে থাকে যেন। আগে থেকেই সাবধান করে' রাখলাম। দেখি কেমন না খাইয়ে পারো।"

রামহরির মাথায় তো বজ্রাঘাত! নীরোদকে দেখে তাঁর মনে হয়, আস্ত যেন একটা হুলো বেড়াল! এবং তিনি খাঁচা-ভর্ত্তি অসহায় একটি পাখী! খাঁচার ভেতরে তাঁকে একলাটি পেয়ে ঘেরাও করে' ঘিরে আস্‌ছে — তাঁকে নিয়েই ভোজ মার্‌বে এই মৎলব! মানস নেত্রে এই দৃশ্য কল্পনা করেই তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

"দেখত দেখত, ওদের ব্যাপারখানা — একবার চেয়ে দেখ—! কি হাঙ্গামা বাধালো হঠাৎ বলো তো! কিছু টাকা না খসিয়ে আর ছাড়ছে না দেখ্‌ছি! ভারী নাছোড়বান্দা—ছিঃ! হতভাগারা যেন বাড়ীতে খেতে পায় না! খাবারদাবার চোখে দেখেনি যেন কোনো কালে! ছিছি—ভারী হ্যাংলা তো! আমাকে কেন অনর্থক জ্বালাতে এসেছে। টাকার গাছ পেয়েছে নাকি আমায়? ছাখো দিকি, কি

ফ্যাসাদে ফেল্‌ল আমায় এরা সবাই জুটে—এই সপ্তরথী মিলে!"

রামহরি গাছ নন্‌ সত্যি, টাকার গাছ তো নয়ই—কিন্তু ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি পাথর হয়ে গেছেন।

কিন্তু বাঁদরদের পাল্লায় পড়্‌লে পাথরও জলে ভাসে। ত্রেতা যুগে একবার ভেসেছিল। রামহরিকেও ভাস্‌তে হোলো!

রামহরি বাজার কর্‌তে বেরিয়ে পড়লেন। রবিবারের তো আর দুদিন মোটে বাকী। অথচ দেখে শুনে কেনা-কাটা করা দরকার—বুঝে সুঝে বাজার করতে হবে তো। সব দোকানেই কিছু ভ্যাজাল ঘি পাওয়া যায় না — সাপের চর্ব্বি অতো সস্তা নয়—এবং আটার বদলে সবাই কিছু ভুসি মাল বেচ্‌তে রাজি হবেনা, খুব কম দাম পেলেও হবে কি না সন্দেহ। এদিকে অপিসশুদ্ধ এতগুলো বন্ধুকে—বন্ধু?—শত্রুকে পাঁচ টাকায় সারা চাট্টিখানি কথা কি? এমন খাওয়া খাওয়াবেন হতভাগাদের—যে বল্‌তে হবে, হ্যাঁ, — অতিথি-সৎকার একটা কর্‌ল বটে রামহরি! জলে যেমন জল বাধে—তেম্‌নি এমন একখানা জাঁকালো ভোজ—যা ভোজ আফ্‌টার ভোজ বাধিয়ে রাখ্‌বে — রামহরিকে তারপর একমাস আর নিজের বাড়ী কষ্ট করে খেতে হবেনা। সপুত্রপরিবার নিয়ে, স্বর্গীয় বন্ধুদের—ভূতপূর্ব্ব শত্রুদের বাড়ীবাড়ী শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে কাটিয়ে দিলেই চলে যাবে।

পাঁচ টাকা ফেলে, পঞ্চাশ টাকা তুলে আন্‌তে হবে—তবেই না তাঁর নাম রামহরি। তাঁর বাবার নাম নরহরি এবং ঠাকুর্দ্দার নাম হরহরি—এবং ঠাকুর্দ্দার বাবার নাম—না, তার ওপরে আর রামহরির জানা নেই! যাদের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্র পান্‌নি, তাদের নাম কি তিনি

মনে রাখতে গেছেন ? আর কি করেই বা তিনি মনে রাখ্‌বেন ?

বাজার ঢুঁড়ে তে-বাস্‌টে তরকারি যোগাড় করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হোলো না। বেলেঘাটায় গিয়ে আটাকল থেকে ভুসি যোগাড় কর্‌লেন, তার সঙ্গে খুসিমতো আটা কিনে—নামমাত্রই কিনে—সেই আটায় ভ্যাজাল্‌ দিয়ে—ভুসির সঙ্গে সেই আটা মিলিয়ে লুচি হবার একটা উপকরণ তৈরি হোলো। সাপের চর্ব্বিটা খুব সস্তাতেই পেয়ে গেলেন এক দাঁওয়ে। বেড়ালের চর্ব্বি বলেই সস্তা হোলো। তার সঙ্গে ঘি ভ্যাজাল্‌ দেবেন কিনা—অনেক মাথা ঘামিয়ে—অনেক সাত পাঁচ করে'—অবশেষে সস্তাদরের ভেজিটেবল্‌ ঘি ধারে কিনে মিশিয়ে দিলেন। ভ্যাজালের সব ধারেই মেশালেন। একেবারে ঘি না দেয়া ভালো দেখায় না। তাতে লুচির অসম্মান করা হয়। লুচি তো হাজার হোক্‌, লুচি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ভুসিই হোক—আর ঘুষিই হোক্‌—লুচিই তো বল্‌তে হবে ওকে ?

এবং বন্ধুদের মিষ্টিমুখ করানোর জন্যে, পাড়ার খোট্টাই ফিরিওলার কাছ থেকে সাত মাসের বাসি লাল লাল জিলিপি কিনে ফেল্লেন—প্রায় বিনে পয়সাতেই। চিলে ছোঁ মেরে বেচারার ডালা উল্‌টে দিয়েছিল—জিলিপিগুলো, না ঠিক্‌ নর্দ্দমায় নয়—প্রায় তার কাছেই—কাছাকাছি রাস্তার ওপরেই গড়াগড়ি যাচ্ছিল—এবং সেই ফিরিওয়ালা, একবার আকাশের দিকে আরেকবার রসাতলের দিকে তাকিয়ে হায় হায় কর্‌ছিল। রামহরিবাবু অম্‌নি দাঁও বুঝে তাকে সাত পয়সা সান্ত্বনা দিয়ে, প্রায় বিয়াল্লিশ খানা, ইয়া ইয়া জিলিপি, কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাগিয়ে নিয়ে এসেছেন।

মিষ্টির হাঙ্গামা তো চুক্‌ল—এখন দই? পচা দই কোথায় পাওয়া যায়? দ্বারিকে কিম্বা জলযোগে মিল্‌বে না—অর্ডার দিলেই যে তাড়াতাড়ি কেউ বানিয়ে দিতে পারবে তাও সম্ভব নয়। পচন-ক্রিয়াটা একটু সময়-সাপেক্ষই কিনা!

অনেক খোঁজাখুঁজি করে' আধপচা দই পাওয়া গেল এক গয়লার কাছে। দু'আনা সের দরে সের দশেক দই পাঁচসিকেয় রফা হোলো। রামহরিবাবু চুক্তি করিয়ে নিলেন, দইটা নিয়ে, খাবার সময়েই—ভোজের শেষমুহূর্ত্তে গিয়ে সে হাজির হবে। দই খেয়ে যখন সবাই কসে নিন্দে করবে—নিন্দে কর্‌তেই হবে—তখন তিনি গয়লাকে খুব করে বকে' দেবেন। গয়লা কিন্তু একটিও টুঁ শব্দ কর্‌তে পাবেনা—মুখ বুজে সেই সব বকুনি হজম করে' বিনা প্রতিবাদে চলে যাবে—ইচ্ছে কর্‌লে, ভুক্তাবশিষ্ট, সেই সব দইও সাথে করে' নিয়ে যেতে পারে। বিনামূল্যেই বই কি! তাতে পাঁচসিকের বরাদ্দ থেকে রামহরি তার একটি পয়সাও আর কমাবেন না — হলপ্‌ করেই বলে দিচ্ছেন—তার কিছুমাত্র ভয় নেই। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখে না।

রবিবার দিন বন্ধুরা সব কোমড় বেঁধে এসেছে এবং পাতা পেড়ে বসে গেছে—হদ্দমুদ্দ খেয়ে, গণ্ডেপিণ্ডে গিলে, যৎপরোনাস্তি ধ্বসিয়ে—রামহরিকে বসিয়ে দিয়ে তবেই তারা পাতা থেকে উঠ্‌বে।

রামহরিবাবুরও কোনো দুঃখ নেই। কোনো গ্লানি নেই মনে। খাওয়ানোর ব্যাপারে কার্পণ্য করা তাঁর কুষ্ঠিতেই লেখে না।

রামহরির বন্ধুরা লুচিগুলো তো কোনো রকমে মুখে তুল্লেন। তুল্লেন—এবং গলার পাঁচিল্‌ পার করে'—পেটের ওধারে গলিয়েও

দিলেন কোনো গতিকে। তরকারীগুলোতো দরকারী জিনিস—লুচি গিল্‌তে হলে তাদের আর বাদ দেয়া যায় না। সেগুলোও তাঁরা, অম্লান-বদনেই, মুখে তুলতে বাধ্য হলেন। কিন্তু লাল লাল জিলিপিগুলোর

একেবারে এক চড়ে গিয়ে তিনি পর্য্যবসিত হন্‌!

কাছে এসে তাঁদের ঘাল্‌ হতে হোলো। ওগুলো তাঁরা সভয়েই দূরে সরিয়ে রাখলেন। রামহরিবাবুর অনেক অনুরোধ-উপরোধে বিস্তর ঢোঁক্‌ গিল্‌লেন কিন্তু ঐ ঢেঁকি গিল্‌তে তাঁরা পারলেন না।

অবশেষে এলো দই। দইওলার সাথে সাথেই এসে পড়ল। দই মুখে তুলেই তো ওঁদের অনেকের চোখ গেল উল্‌টে — এক আধ জন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সেই সময়েই দইওয়ালা আবার দাম চাইল।

রামহরিবাবু সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লেন—"তোমার কি রকম আক্কেল হে গয়লার পো? এই দই কি মানুষকে ছায়? এর চেয়ে বিষ দিয়ে গেলে না কেন? আফিম দিয়ে গেলেই পারতে। অন্ততঃ পক্ষে সেঁকো বিষ! এর চেয়ে সস্তায় কাজ সার্‌তে তা হলে। এই রকম মানুষ খুন্ করার পেশা কদ্দিন ধরেচ? য়্যাঁ?—"

গয়লা কিছু বলেনা। মুখটি বুজে থাকে।

রামহরিবাবু আরও ক্ষেপে যান্—"ঠকাবে বলে' কি এম্‌নি করেই ঠকাতে হয়? একেবারে পচা বিচ্ছিরি দই—জোঁদা টক্—যাচ্ছেতাই রাম রাম্—দশ আনা করে' সের নিয়েছ—তারপরে ফের গলায় ছুরি!"

গয়লারপোর গলায় তবু কোনো সাড়া নেই।

রামহরির বন্ধুরাও সব ছ্যা-ছ্যা করতে থাকে।

রামহরিবাবু, বন্ধুদের উৎসাহে, ক্রমশই আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ক্রমশঃই তাঁর মেজাজ্ আরও গরম হয়ে ওঠে।

"সাধে কি আর তোমাদের বলে আশী বছরে সাবালক! তোমাদের বুদ্ধি আর গোরুর বুদ্ধি প্রায় সমান! আশী বছরের খাসী কোথাকার—"

তাঁর হম্বিতম্বি আরও বাড়তেই থাকে। আওয়াজও চড়া চড়া হয়। "আমার এত বড়ো ভোজটাই মাটি করে' দিল গা! বোকা—পাজি—উল্লুক কোথাকার—!" বল্‌তে বল্‌তে তাঁর রাগ এমন চড়ে' ওঠে, যে হঠাৎ তিনি এগিয়ে, গয়লার গালে ধাঁ করে' এক চড় কসিয়ে ছান্

—গালাগালি ছেড়ে একেবারে এক চড়ে গিয়ে তিনি পর্য্যবসিত হন্।

গয়লা অম্‌নিই বিদ্রোহ ঘোষণা করে—"একি বাবু! বক্‌বার কথা ছিল, মার্‌বার কথা ছিল না তো! একি রকম কথা?"

"আরে থাম্ থাম্, কি বল্‌ছিস্! চুপ্ কর্!" রামহরির বাবুর প্রজ্বলন্ত আগুণে জল পড়ে' যায় হঠাৎ।

"চুপ্ করব কি, আপনার সঙ্গে আমার কি চুক্তি ছিল তাই বলুন্!"

"আরে থাম্ থাম—হঠাৎ মার্ খেয়ে তোর মাথার ঠিক নেই। আমি মারব বলে' তোকে মারিনি, কিছু মনে করিস্‌নে লক্ষিটি?—"

"ধাঁ করে' আপ্‌নি এক চড় কসিয়ে দিলেন, অথচ আপনি নিজেই—" গয়লার পো ছাড়বার পাত্র নয়। একেই তার জ্ঞান বুদ্ধি কম, তার ওপরে এক চড়ে, যাও ছিল, সব একেবারে গুলিয়ে গেছে।

"আহা দামই নিবি না হয়। পুরো দামই নিবি—তার কি হয়েছে!"

"না-না বাবু—সে সব হবে টবে না—"

"না হয় দশ আনা সের দরেই দাম দেব তার কি হয়েছে? পচা জিনিস বলে' দাম কমাবো বলেছি কি? না, দাম আমি কমাবো না —সে ছেলেই নয় রামহরি। না হয় পাঁচসিকে সেরই নিস্—নগদ্ পঞ্চাশ টাকাই ধরে' নিস্ না হয়। অত কথা কিসের? রামহরি কখনো কার্পণ্য করে না খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। আর যখনই এই ভোজ জুটেছে তখনি সে জানে যে বাজে খরচ রয়েছেই বরাতে। তার জন্যে ভেবে কি হবে? তোর দই না হয় মুখে তোলাই গেল না —তার কি—চারগুণ দাম নিয়ে তুই বাড়ী যা।"

ফুট্‌বল খেল্‌তে গিয়ে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌টা ছিঁড়েছি, কিন্তু মেজ মামাকে সে-দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দিতেই তিনি আগুন হয়ে ওঠেন—"আমার সময় নেই বাপু! তোমার সঙ্গে বাজারময় টো টো করা আমার কর্ম্ম না। দেখছ আমি টাই নিয়ে টানাটানি করছি—তাই বাগাতেই হিম্‌সিম্—বেরুই কখন? পারো, গিয়ে দেখে শুনে নিজেই কেনো গে।"

আমি তাতেই রাজী হই। দশ টাকার একখানা নোট দিয়ে তিনি বলেন—"জানি ঠিক ঠকিয়ে নেবে। দুনিয়াশুদ্ধ লোকই তোমায় ঠকায়। ঠকাবার জন্যেই বসে আছে তারা। কিন্তু করব কি, আমার এখন একটা চকোলেট চাখ্‌বারও ফুর্‌সৎ নেই।"

ফুর্‌সৎ থাক্‌লেই যেন সবাই ওঁকে চাখ্‌তে দিচ্ছে কিনা! এ কেবল আমাকে রাগিয়ে দিয়ে চকোলেট বাগিয়ে নেবার ফন্দী, তা আমি বেশ বুঝেছি।

"হ্যাঃ, অম্‌নি ঠকালেই হোলো! আমি কি অতো কাঁচা ছেলে?

আমার কাছে আদায় করা অতো সোজা নয়! আমি হচ্ছি এক নম্বর! আমাকে ঠকাবে এমন তো কাউকে দেখি নে এই ভবানীপুরে! আমাকে কি তুমি জবা পেয়েছ?" প্রবল প্রতিবাদ করি আমি।—"আমিই না কাউকে ভুলে ঠকিয়ে ফেলি এই আমার সর্ব্বদা ভয়।"

"যাও, তবে জবাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। টু হেড্‌স্ আর্ বেটার্ দ্যান্ ওয়ান্। টু মাইনাস্ মেক্ ওয়ান্ প্লাস্, টু নেগেটিভ্‌স্ মেক্ ওয়ান্ পজিটিভ্, য়্যাণ্ড্—য়্যাণ্ড টু চিল্‌ড্রেন্ মেক্ ওয়ান্—মেক্‌ওয়ান্—মেক্‌ওয়ান্‌টা কি মনে আস্‌ছে না তো।—" হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন মেজ মামা।

? ?—দুটি চোখ জিজ্ঞাসার চিহ্ন করে' মামীমার দিকে তিনি তাকান্।

মামীমা—বলে' দ্যান্—"মেক্ ওয়ান্ ম্যাড্।" মামীমার বিদুষিতা দেখে, মামার দুই চোখ "— ! !—" তক্ষুনি বিস্ময়ে ভরে' ওঠে।

"বেশ, তাহলে ওরা দুজনেই যাক্ তাহলে, ক্ষেপে গেলে ঠকাবার কথা ভুলে যাবে দোকানদার।" মেজ মামা বলেন। "বেমালুম ভুলে যাবে স্রেফ্।"

নামজাদা একটা পরিচ্ছদ-ভবনের ঠিকানা বাৎলে দিয়ে মেজ মামা আমার বুদ্ধির ধারকে শানিয়ে আরো ধারালো করবার চেষ্টা করেন—"দেখিস্! দাম যা বল্‌বে ঠিক তার অর্দ্ধেক বল্‌বি। নইলে ঠকে যাবি, মনে থাকে যেন।"

আমাকে দেখেই অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসে দোকানদার—হাসিমুখেই এগোয়।

"কি চাই খোকাবাবু ? কি চাই তোমার খুকি ?" জিগ্যেস করে।

খোকাবাবু শুনেই আমি চটে গেছ্‌লাম—কেন, আমি কি খোকা ? থার্ড ক্লাসে পড়্‌ছি মিত্র ইস্কুলে—খোকা এখনো ? অপেক্ষায় ছিলাম, জবাকেও খুকীবাবু বলে কি না ! বল্লেই ঠাস্‌ করে' এক চড় কসিয়ে দেব। মেয়েছেলের অপমান আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। দেব কসে' চড়িয়ে, হাসিমুখ ফাঁসির মুখ হয়ে যাবে তখন !

কিন্তু না, খুব সাম্‌লে নিয়েছে লোকটা, খুকীবাবু আর বলেনি। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেল আজকে।

আমাকেও আর মেয়েছেলের অপমান সহ্য কর্‌তে হোলো না।

"একটা হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌ কত পড়্‌বে ? বেশ ভালো হাফ্‌প্যাণ্ট চাই।"

দোকানদার পছন্দসই কয়েকটা হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌ দেখায়।

"কতো আর ! টাকা চারেক।" দেখাতে দেখাতে বলে।

"বড্ড বেশী দাম যে হে ! অত পারব না। দু টাকা দেব আমি।"

দোকানদার বলে—"দুটাকা ! দুটাকায় হয় কখনো ? তবে তুমি ছেলেমানুষ সেই কারণে তিন টাকা যদি হয় তো বলো। তিন টাকায় দিলে দিতেও পারি।"

"অত শত জানি নে। দেড় টাকায় দিলে তো দিলে, নইলে এই চল্লুম।" আমি সাফ্‌ বলে' দি'।

"দেড় টাকা !" লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে। "দেড় টাকায় হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌—খুব কম হচ্ছে নাকি ? অত্যন্ত খুব কম হয়ে যাচ্ছে নাকি ? তুমিই বিবেচনা করো।" লোকটা একটু ঢোঁক্‌ গিলে নেয়,— "কিন্তু খদ্দের ছেড়ে দেয়া আমি পছন্দ করি না, বেশ ঐ দু'

টাকাই দাও, তুমি নিজ-মুখেই যা বলেছ। হাফ্ প্যাণ্ট্‌টা দিয়ে দিচ্ছি তোমায়। এক কথাতেই দিয়ে দিচ্ছি।"

"দেখছ না, আমি টাই নিয়ে এখন আইঢাই খাচ্ছি!"

অনুরোধে পড়ে আমি পুনর্ব্বিবেচনা করি—করতেই হয় আমাকে, "না বাপু, ওই এক টাকা হবে, এক টাকাই,—ওর বেশী নয়।"

"ও বাবা! তুমি যে ভারী শক্ত মক্কেল দেখ্‌ছি। যাক্‌, ওই দেড় টাকাতেই রফা হোলো—প্রথমবার তোমার কাছে লাভ নাই আর কর্‌লুম!" দোকানদার দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে। "তাহলে ওই দেড় টাকাই ফ্যালো! কী আর করবে?"

"উঁহু, বারো আনায় হয় তো দাও।" আমি দারুণ গম্ভীর হয়ে যাই। আমাকে ঠকাবার চেষ্টা চল্‌ছে, বেশ বুঝ্‌তে পারি।

"য়্যাঁ? বারো আনা! তুমি বার বার আমার পিলে চম্‌কে দিচ্ছ বাপু হে!" লোকটা একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়ে। "পঁচিশ বছর দোকান কর্‌ছি। কিন্তু এমন কঠিন বালকের পাল্লায় কখনো পড়িনি।"

দোকানের মাথায় টাঙানো দণ্ডায়মান পরমহংসদেবের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে তাঁর বিখ্যাত হাতের ভঙ্গীর অনুকরণ করে' বলে দোকানদার—"কিন্তু কী আর করা! বউনির সময়ে এসে পড়েছো, তোমাকে তো আর ফেরানো যায় না। বার আনার সঙ্গে আর চার আনা বাড়িয়ে দাও কেবল! ওই এক টাকাতেই দিয়ে দেব ওটা।"

সুদীর্ঘনিশ্বাস দিয়ে সে উপসংহার করে।

"য়্যা-ক্‌-টা-কা! বলো কি? আট আনা হলে বরং দেখা যেতে পার্‌ত।" আমাকে ঠকাবার সুযোগ কিছুতেই ওকে দেব না, আমি একদম্‌ মরীয়া। "হ্যাঁ, চেষ্টাচরিত্র করে' দেখা যেত তাহলে।"

জবা ফিস্‌ ফিস্‌ করে—"নিয়ে নে ছোড়্‌দা! এক টাকা তো খুব সস্তাই হোলো।"

আমি উচ্চকণ্ঠেই জানিয়ে দিই—"পাগল হয়েছিস্‌ তুই! দেখ্‌ছিস্‌ না ওর বিক্রীর মৎলব নেই।

জবাকে নিয়ে আমি প্রায় পা বাড়াই আর কি! দাঁড়াতেই চাইনে!

"আহা, থামো থামো! বউনির সময়ে খদ্দের ফেরানো নিয়ম নয়—তাহলে মা লক্ষ্মীই ফিরে যান্ নাকি! আচ্ছা, বারো আনাই বার করো তুমি।" তাই যথেষ্ট।

দোকানদার দ্বিতীয় রামকৃষ্ণদেব হয়ে দাঁড়ায়!

এ-পকেট ও-পকেট হাতিয়ে-হাত্ড়ে খুচরো-খাচ্রা মিলিয়ে-জুলিয়ে মোটমাট ছ'আনা বহির্গত হয়। বাড়ন্ত এবং চূড়ান্ত ঐ ছ' আনাই কেবল!

"ছ্যাখো এই ছ'আনাই রয়েছে। এতে হবে তো বলো?"

"আট আনাও নেই?" দোকানদার করুণস্বরে প্রশ্ন করে আমায়।

"উঁহু, এই ছ' আনাই। তবে এর মধ্যে একটা অচল ছুয়ানি— সে কথা আগেই বলে দিচ্ছি। সুতরাং তোমার আসলে দাঁড়াচ্ছে গিয়ে চার আনা।" হ্যাঁ, আমি আগে-ভাগেই সাবধান করে' দি, ওকে ঠকানোর অভিপ্রায় আদপেই আমার নেই: "এই আধময়লা সিকিটা! 'এটা বোধহয় ততো খারাপ নয়।"

"চার আনা! চার আনায় হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌? চার টাকার জিনিস চার আনায়! নাঃ, তুমি আমায় পাগল করে' দেবে।" দোকানদার তার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন সুরু করে' ছ্যায়। "না, তার চেয়ে বরং অম্‌নিই দেবো। বউনির সময়ে এসেই মাটি করেছ,—মাথা খেয়েছ আমার।"

ওর যে ঠকাবার মৎলব তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিই—"অম্‌নি দিলে ছুটো নেব কিন্তু। তার কমে নয়।"

জবাও আবার মুখ খোলে—"তাহলে ছুরকম ছুটো নেয়া যাক্‌। ছুটো হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ নিয়ে তুই একা কি করবি? তার চেয়ে আমার একটা ফ্রক্‌ নেয়া যাক্‌ বরং!"

বাড়ী ফেরার পথে জবা বলে—"ফ্রক্‌টা বেশ চমৎকার পাওয়া গেছে, কি বলিস্‌ ছোড়্‌দা? খাসা আমায় মানাবে কিন্তু!" "আমার হাফ্‌-প্যাণ্ট্‌টাই বা এমন মন্দ কি?" আমিও মুরুব্বিয়ানা চালে মাথা চালি, "ঠকলাম তো, এখন ঠক্‌লাম কি না তা মেজমামাই বল্‌তে পারেন!"*

---

* 'সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি'র গ্রন্থকার স্বনামখ্যাত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর দেয়া একটি প্লটের [illegible]র ভিত্তি করে' এই গল্পটি লে[illegible]